বাংলাদেশে মাজার ও সুফি-সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক আঘাত
একটি পর্যালোচনা

সূচিপত্র

১. ইসলাম ও সুফিবাদ

২. সুফিবাদের প্রাসঙ্গিকতা

৩. বাংলাদেশের সুফি-সাধক

৪. বাংলাদেশে মাজার ও সুফি সংস্কৃতির উপর আঘাত

৫. বাংলাদেশে সুফি-সংস্কৃতি

৬. সুফি সংস্কৃতির নানা দিক: "পীর-মুরিদ" সম্পর্ক

৭. মাজারে হামলার কুফল

৮. বাংলাদেশের সমাজজীবনে মাজারসমূহের প্রভাব

৯. মাজার সংরক্ষণের কর্মপন্থা

১০. মাজারপন্থীদের সাথে জামায়াত-হেফাজতের দ্বন্দ্ব

১১. পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী

১২. মাজার ও সুফিপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের সখ্যতা

১৩. আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মাজার ও সুফি সংস্কৃতির উপর আঘাত

১৪. উপসংহার

বাংলাদেশে মাজার ও সুফি-সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক আঘাত: একটি পর্যালোচনা

১. ইসলাম ও সুফিবাদ

মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। আল্লাহপাক বলেন, ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম (সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯) অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।' তিনি আরো বলেন, ওয়ামাইয়াবতাগি গাইরাল ইসলামি দ্বীনান ফালাইয়ুক্ববালা মিনহু ওয়াহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন (সুরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৫) অর্থাৎ 'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কষ্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' কেননা, আল্লাহতাআলা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি হিসেবে কেবলমাত্র ইসলামকেই মনোনীত ও পছন্দ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতেও আমরা সে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করি। আল্লাহ বলেন, আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিমাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা (সুরা মায়েদা, আয়াত-৩) অর্থাৎ 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দিন হিসেবে পছন্দ করলাম।'

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম; উদারতা, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, অসা¤প্রদায়িকতা এবং প্রেমের ধর্ম। এতে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ও বিধিবদ্ধ এক জীবন ব্যবস্থা। সর্বমানবের মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার তরে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর আয়োজন রয়েছে এই মহান ধর্ম ইসলামে। জীবনের সবকাজে আল্লাহর আনুগত্যই হলো ইসলাম। মহানবি হজরত মোহাম্মদ (সা.) নিজে তা কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি আদর্শ মুসলমান। তিনি পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করেছেন। তাঁকে যিনি যত বেশি অনুসরণ করতে পারবেন তিনি তত ভাল মানুষ হিসাবে পরিগণিত হবেন। নামায-রোযা ও যাবতীয় কর্মের ভেতর দিয়ে আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণই ইসলাম। মনীষী থমাস কারলাইল (১৭৯৫-১৮৮১ খ্রি.) বলেন, 'Islam means in its way denial of self, annihilation of self. This is yet the highest wisdom that heven has reveald to our earth.' ইসলাম সম্পূর্ণ নূতন ধর্মমত নয়। অন্যান্য নবি যেসব সত্য প্রচার করেছেন ইসলামে সে সমস্তই আছে। তদুপরি কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থাও তাতে রয়েছে। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে সর্বধর্মের সমন্বয়। ভিন্ন ধর্মের লোক ইসলামে প্রবেশ করলে তিনি পূর্ববর্তী ধর্মের সত্যগুলো তো পানই, অতিরিক্ত কতকগুলি সুবিধা-সুযোগও পেয়ে থাকেন। এটি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি হলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য। এই সমস্তই মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করে থাকে।

পবিত্র ধর্ম ইসলামের দুটো প্রধান অধ্যায় রয়েছে। এর একটি অন্তরঙ্গ ও অপরটি বহিরঙ্গ এবং একইসাথে একটি ব্যতীত অপরটি অসম্পূর্ণ। তাসাউফ তথা সুফিবাদ ইসলামের অন্তরঙ্গ এবং শরিয়ত এর বহিরঙ্গ হিসেবে সাব্যস্ত। সুফিবাদ শরিয়ত বিরোধী নয়। ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে বটে, কিন্তু যে মৌলিক

কারণে এই অনুশাসনের সৃষ্টিÑ তা চিন্তা করে তদানুসারে মনোবৃত্তি ও কার্য সম্পাদন উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সুফি-সাধকেরা কাজে ও চিন্তায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঐশী ইচ্ছার উপর সমর্পণ করেন এবং প্রতিটি যুগের ও সকল দেশের প্রত্যাদিষ্ট বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। সুফিগণ জাতি, স্থান ও কাল নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করেন এবং সবাইকে সমান ও সমমর্যাদার জ্ঞান করেন। কেননা জাতি-বিরোধ হলো ইসলামের অনুশাসন বিরুদ্ধ বিষয়। সুফিদের প্রভু সকল জগতের প্রভু। তিনি কোনো বিশেষ জাতির প্রতিপালক নন, তিনি সকল আলমের প্রতিপালক। সারা বিশ্বের একমাত্র প্রভু তিনি এবং তাঁরই জন্য সমস্ত মহিমা, শক্তি ও মাহাত্ম্য। সকল সৃষ্টজীব একই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। অন্য কোনো ধর্ম এই বিশ্বজনীন স্বপ্ন কার্যে পরিণত করতে সমর্থ হয়নি। প্রকৃতি একত্বের পরিচায়ক। উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত আর জড় জগত একই নিয়মের অধীন। গ্রহ, উপগ্রহ, নদী, পর্বত পরস্পর বিভিন্ন হলেও একই বিধানের অনুবর্তী। সৃষ্টবস্তুর বহুত্বের মধ্যে একত্ব সর্বদা বিরাজমান। সুফিবাদ এই বিশ্বজোড়া একত্বের পরিপোষক।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে রুহ (আত্মা) এবং নাফ্স (প্রবৃত্তি) রয়েছে। এ দুটি পার্থিব পরীক্ষার উপাদান। পরস্পর যুদ্ধ করাই এদের প্রকৃতি। আত্মা চায় প্রবৃত্তির উপর সওয়ার হতে আর প্রবৃত্তি আত্মার উপর প্রভুত্বের প্রয়াস চালায়। আত্মার আগমন পরমাত্মার কাছ থেকে আর সে পরিচালিত হয় তাঁরই আদেশে। আত্মা মানুষকে সৎপথে চালিত করে প্রভুর নৈকট্য লাভ করার জন্য সর্বদা উদগ্রিব থাকে। অপরদিকে প্রবৃত্তি আত্মার আবেদন উপেক্ষা করে মানুষকে অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকায় ফেলতে সদা প্রস্তুত থাকে এবং শয়তানও নাফসের সাথে সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে রুহকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট থাকে। আত্মা ও প্রবৃত্তির এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন এবং অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। আর মানুষকে আমৃত্যু এই দ্বন্দ্বের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে হয়। সুফিবাদ প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করে আত্মার সজীবতা আনয়নপূর্বক পরমাত্মার সাথে মিলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সুফিদের আত্মা হয় নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ আর তাঁদের নাফ্স হয় নাফসে মুতমাইন্নাহ (The nafs at peace)।

সুফিবাদ কিভাবে আসল, এর উদ্ভব কি করে হল- এ প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ এর উৎপত্তি ভাববাদ থেকে হয়েছে বলে মনে করেন। এই বিশ্ব সৃষ্টির বিকাশ কি করে ঘটল? কেই বা এর বিকাশ ঘটালেন? আমি কে? আমার উৎস কি? আকাশজুড়ে অগণিত তারকার আবির্ভাব কি করে ঘটল? সৃষ্টিরাজ্যে স্রষ্টার স্বাক্ষর যদিও ভাস্বর হয়ে আছে তবু স্রষ্টা স্বয়ম্ভূ হলেন কি করে? এসব অনন্ত জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব খুঁজতে গিয়ে মানুষ অন্তহীন ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আসছে। আর এ ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হলো ভাববাদের আর এ ভাববাদ থেকে জন্ম নিল সুফিবাদ। কিন্তু ইসলাম তা স্বীকার করে নি; বরং সুফিবাদ ইসলামেরই নিজস্ব সৃষ্টি। যেহেতু স্রষ্টা ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র হাদিস গ্রন্থসমূহেও স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত¡ সম্পর্কিত বহু বক্তব্য রয়েছে। কোরআন ও হাদিসের এসব তত্ত¡বহুল বাণীসমূহের উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয়েছে স্রষ্টা, সৃষ্টি, জীবন ও জগত সম্পর্কিত ইসলামের নিজস্ব চিন্তাধারা। পবিত্র ইসলামের এই নিজস্ব চিন্তাধারাকেই পরবর্তীকালে সুফিবাদ বা সুফিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে সুফিবাদ প্রবেশ করে সেন রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের (১১৭৯-১২০৪ খ্রি.) অবসানের সাথে সাথে এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (১২০৪ খ্রি.) মাধ্যমে। বঙ্গ বিজয়ের পর আরব, পারস্য ও তুরস্ক থেকে দলে দলে মুসলিম দরবেশ ও সুফিগণ এদেশে আগমন করেন এবং ইসলামের বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তির কথা প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের চারিত্রিক গুণ, খোদা-প্রেম ও প্রচারিত বাণীর বদৌলতে অজস্র অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। এদেশে ইসলাম তরবারি দিয়ে আসেনি; বরং সুফি-দরবেশদের উদার, নৈতিক ও প্রেমময় বাণীর মাধ্যমেই এসেছে যার উজ্জ্বল নিদর্শন এই বাংলায় আগত সুফিগণের নিরলস প্রচার ও এতদঞ্চলের গণমানসে তার সহৃদয় স্বীকৃতি।

আমাদের এ বাংলা মুলুকে যে পির-দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুগে আগমন করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে যোদ্ধৃ জীবনের পরাকাষ্টা ছিল সংযুক্ত। বিক্রমপুরের বাবা আদম শহিদ (খ্রি. ১১ শতক), মোমেনশাহির মদনপুরের শাহ সুলতান রুমি (আগমন ১০৫৩ খ্রি.) বা সিলেটের হযরত শাহজালালের (১১৯৬-১৩৪৬ খ্রি.) জীবনে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে সংগ্রামশীলতারও সমাবেশ ছিল। এদেশের যে কোনো ধর্মপ্রচারকের জীবনীতে দেখা যায়, এঁরা কেউ শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারক ছিলেন না বা শুধুমাত্র মুজাহিদ ছিলেন না; অতি উচ্চস্তরের দরবেশও ছিলেন এবং ব্যক্তি-মানস হিসেবে তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ। তাঁদের চরিত্রে, নৈতিকতায় আর মূল্যবোধে মানবিকতা আর অসাম্প্রদায়িকতার প্রোজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। আজকের বাংলাদেশে সুফিবাদের উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী আদর্শকে মেনে চললে সমাজদেহে প্রত্যাশিত শান্তি ও নিরাপত্তার ফল্গুধারা প্রবহমান থাকবে- একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

২. সুফিবাদের প্রাসঙ্গিকতা

সুফিবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি (মৃ. ১২২৫ হিঃ) রচিত তাফসিরে মাযহারিতে বলা হয়েছে, যেই জ্ঞানের অধিকারীবৃন্দ সুফি নামে অভিহিত; যাঁরা ফরযে আইন (অবশ্য কর্তব্য, অবধারিত) মেনে চলেন। কেননা, এই এল্ম অন্তরকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু) আসক্তি হতে মুক্ত করে সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন রাখে। স্বার্থপরতা, অহংকার, হিংসা, পার্থিব লোভ, জাগতিক আসক্তি, ইবাদতে আলস্য, ভোগী-বিলাসী হওয়া এবং রিয়া ও ভণ্ডামী প্রভৃতি কুরিপুসমূহ হতে অন্তরাত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। একইভাবে সুফিবাদ, তওবা (অনুতাপ বা পাপ হতে প্রত্যাবর্তন), খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা, নেয়ামতের শোকর, বিপদাপদে সবর প্রভৃতি গুণের দ্বারা অন্তরকে সুসজ্জিত করে।

মানবজীবনে অত্যাবশ্যকীয় দুর্লভ গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন সুফিরা। জীবন চলার পথে তাঁরা নিজেদেরকে ফুটিয়ে তোলেন ইনসানে কামেল হিসেবে। সুফির জন্য প্রত্যাশিত ও অবধারিত গুণের বিষয়গুলো হলো যথাক্রমে, বৈধ উপার্জন, সত্যকথন, সংকল্পের দৃঢ়তা, স্বীয় কর্মকাণ্ডে সচেতন থাকা, সর্বদা স্রষ্টার স্মরণ, দৃষ্টি সংযতকরণ, নির্জনে ধ্যান এবং সবকিছু উপেক্ষা করে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের উপর অবিচল থাকা। পৃথিবীর সকল দেশের সম্প্রদায়-সিদ্ধ প্রাচীন দর্শনগুলো থেকে সুফিদর্শনের একটা আলাদা বিশেষত্ব ছিল এবং আছে। এই বৈশিষ্ট্য তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গরিমা; যা অসাম্প্রদায়িক ও হৃদয়াভিরাম।

সুফিবাদের প্রধান প্রত্যাশা হলো পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া। আর এ প্রত্যাশার চূড়ায় উপনীত হওয়ার জন্যই সুফির ক্লান্তিহীন অবিরাম পথচলা অত্যাবশ্যক। সে পথটির নামই হলো তরিকত (path)। সুফিরা তরিকতের প্রশস্ত রাজপথ থেকে শুরু করে সংকীর্ণ অলি-গলিতে বিরামহীন পথযাত্রায় নিয়োজিত থাকেন। তরিকতের সাত মনিজল বা মোকাম (stage) যথাক্রমে তওবা (কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা, ক্ষমাপ্রার্থনা), অরা (abstinence) যুহ্দ (renunciation), ফাকর (poverty), সাবর (patience), তাওয়াক্কুল (trust in God), আর রেযা (satisfaction) এর সাধনার মাধ্যমে সুফিরা উপনীত হন তাঁদের কাঙ্খিত মনিজলে মকসুদে। এই সপ্তধাপ অতিক্রম করতে হলে তাঁদের মুখোমুখি হতে হয় আরো দশটি হাল বা অবস্থার (state); যেগুলো হলো: মোরাকাবা (meditation), কুরব বা নৈকট্য (nearness to God), মহব্বত (love), খাউফ বা ভয় (fear), রেজা (hope), শওক (longing), উন্স (intimacy), এত্মিনান (tranquillity), মোশাহেদা (contemplation), এবং ইয়াকিন (certainty)। কোনো একজন সুফি যদি এসবের প্রতিটি মনিজলে অবস্থান করে সাধনার অভিজ্ঞতা অর্জন না করে এবং প্রতিটি হালের (stage) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ না করে তাহলে তাঁর পক্ষে তরিকতের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

পারস্যে সুফিবাদের উত্থান ও বিস্তৃতিকালেই সিরিয়া, মিসর, তুরস্ক এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এ মতবাদের প্রসার ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদের আগমন, প্রভাব ও প্রসার- এ গতিরই একটি স্বাভাবিক পরিণতি। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদ প্রবেশ করে। অবশ্য বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থের তথ্যমতে, আরব বণিকদের ব্যবসা সূত্রে অষ্টম শতাব্দীতেই ভারতীয় অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন সম্ভব হয়। তথাপি একাদশ শতাব্দীকেই বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সুফি মতবাদ প্রচারের যথার্থ কাল বলে বিদ্বানেরা সাব্যস্ত করেছেন।

বাংলায় আগমণকারী সুফি-দরবেশগণ অনেক সময় অলৌকিক কারামত দেখিয়েও এতদঞ্চলের মানুষদের মুগ্ধ ও অনুগত করেছেন। প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও শাসকেরা অনেকেই সহজে এঁদের আগমণ ও ধর্মপ্রচার মেনে নিতে পারেনি। বস্তুত ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ একত্ববাদ ও এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই পৌত্তলিক নরপূজা, প্রতীমাপূজা ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ও জয়লাভে সমর্থ হয়েছেন। ইসলামের উদার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতির বলেই ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্পৃশ্যতা, বর্ণবাদ ও সা¤প্রদায়িক কুপমণ্ডকতা থেকে উদ্ধার করে এক জমায়েতে একই শ্রেণীভুক্ত সকল মুসলিমকে এক ও অদ্বিতীয় সাম্যের আদর্শ পতাকাতলে সমবেত হতে সহায়তা করেছে। জালালুদ্দিন রুমি, ইবনুল আরাবি, হাফিজ শিরাজি প্রমুখের সুফি মতবাদের প্রভাব আমাদের বাংলার মুর্শিদি, বাউল ও ফকিরি গানে; বিশেষ করে লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রি.), হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২ খ্রি.) ও রমেশ শীলের (১৮৭৭-১৯৬৭ খ্রি.) গানে অভূতপূর্বরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুফিবাদ বাংলায় প্রবেশের পর সহজিয়া সাধনপন্থা দ্বারা তা অভিভূত হতে থাকে। বাংলার সংস্কার, লোকাচার, বিশ্বাস ইত্যাদির সাথেও সুফিমতের সম্মিলন ঘটে। সুফিদের আদর্শ ধ্যান-ধারণা এবং সাধন প্রণালীও এদেশের সাধকগণ অবলম্বন করেন। সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে ভাব-বিনিময় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে এদেশের সাধারণ

মানুষ পির, ফকির, সুফিদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সম্পদ ও স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পির, ফকির ও সুফিদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দরবেশগণই বাংলাদেশের ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষজনের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যই এইসব পির-দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন।

সুফি ও উলামায়ে কেরাম বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যে ভূমিকা পালন করেন তা বিস্ময়কর। আরব, ইয়ামেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সুফি ও আলেমগণ বাংলায় আসেন। কেউবা নৌপথে, আবার কেউবা স্থলপথে ও পদব্রজে চলে এসেছেন। চৌদ্দ শতকে ভূপর্যটক ইবনে বতুতা একদিকে বাংলার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সস্তা মূল্য দেখে অভিভূত হয়েছেন। আবার অন্যদিকে বাংলার আবহাওয়া তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন, দেশটি ভেজা ও অন্ধকার এবং খোরাসানবাসীদের মতে এ দেশ ঐশ্বর্য সম্ভারপূর্ণ জাহান্নাম। এ দেশের প্রাণের সাথে আরব-পারস্যের প্রাণের ত্রিবেনী-সঙ্গম ঘটে যায়। বিখ্যাত সাধক কবির (১৩৯৮-১৪৪০ খ্রি.) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ 'প্রয়োগ' ক্ষেত্রে পরিণত হন। কবিরের মধ্যে ভারতীয় যোগসাধনা ও সুফিবাদী ব্রক্ষবাদ মিলিত হয়। ফলে সুফিরা সাক্ষ্যভাবে তাঁর ভিতর দিয়ে ভারতীয়দের এবং ভারতীয়রা সুফিদের প্রাণের সন্ধান লাভ করেন।

সুফিবাদ মানুষকে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলি অর্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সুফিবাদ মানুষকে উদার, সহনশীল ও পরমতসহিষ্ণু করে। নিজের কাজে-কর্মে দায়িত্বশীল হতে শেখায় এবং অন্যের প্রতি অধিকতর দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। সুফিবাদ মানুষকে বিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, পাপাচারমুক্ত ও নিঃস্বার্থ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে। পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ রেষারেষি বন্ধের মাধ্যমে মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। একে অন্যের অধিকার সংরক্ষণে সচেতন থাকার ও অপরের প্রতি সম্মানবোধের শিক্ষা দেয় সুফিবাদ। তাই সুফিবাদের মতো এমন এক কল্যাণমূলক মতবাদ যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং মূল্যবোধের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নিয়ামক শক্তি হতে পারে।

হাজারো সুফি-অলির পদভারে ধন্য আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এদেশের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। বিশ্ব সমাজ-সভ্যতার মানবিক বিকাশেও অবদান রাখার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বিপুল সম্ভাবনার স্বাধীন, সার্বভৌম এই দেশটির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে রয়েছে হাজারো বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা। এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে অস্থীতিশীলতা, আস্থাহীনতা, দ্ব›দ্ব, অবিশ্বাস, হানাহানি, হিংসা-জিঘাংসা। দেশপ্রেম, দায়িত্বশীলতা ও দেশের প্রতি মমত্ব ও দায়বোধের পরিবর্তে অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, পরশ্রীকাতরতা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, খুন, রাহাজানি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত এ অবস্থা কারোরই কাম্য নয়। আমরা মনে করি, সুদূর অতীত থেকে পির, দরবেশ ও সুফিরা শান্তি, সফলতার যে বার্তা নিয়ে এতদঞ্চলে আগমন করেছিলেন এবং এদেশের প্রতিটি জনপদে সহিষ্ণুতা আর সহাবস্থানের প্রেমময় বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন; আমরা তাঁদের সেই আদর্শ ও শিক্ষা থেকে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছি।

সত্য, ন্যায়, ভালবাসা আর প্রেমের মধুময় আহ্বান আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনে আজ প্রত্যাখ্যাত। ফলে এই অরাজকতা, পাশবিকতা বিরাজ করছে। আর পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অজস্র অন্তরায়। মিথ্যা, লোভ আর জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সমাজ তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কখনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। এখানেই সুফিবাদ হলো পরম সুহৃদ; এর অপরিহার্যতা এখানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। কেননা, সুফিবাদ মানুষ ও মানবতাবিরোধী কার্যাবলিকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। সুফিবাদ মানুষকে খাঁটি মানুষ, পরিপূর্ণ মানুষ আর সমাজ-সভ্যতার জন্যে উপযোগী নিয়ামক শক্তিসম্পন্ন সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। তাই অশান্ত ও অস্থীর এই সমাজে সুফিবাদের সঠিক শিক্ষার প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইপ্সিত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আসবে এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে শান্তিময় এক স্বাপ্নিক সমাজ বিনির্মিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বস্তুত মানুষের মন চিররহস্যময়। অথচ মনই হচ্ছে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালক। এই মনের বিস্ময়কর রহস্যময়তা ভেদ করে তাকে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করার ব্যাকুল প্রয়াস চলে আসছে আলোকিত মানব-মনের প্রতিটি ধাপে। মহামহিম স্রষ্টাকে জানার সে সুতীব্র আকুলতা থেকেই সূচিত হয়েছে সুফিবাদের।' আর সুফিবাদের পুষ্পোদ্যানই হচ্ছে জাত (স্রষ্টা) ও সিফাতের (সৃষ্টি) প্রকৃত মিলনকুঞ্জ।

৩. বাংলাদেশের সুফি-সাধক

সুফিবাদ একটি উদার, অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল ও সর্বজনীন প্রেমময় মতবাদ। ব্যক্তি জীবনকে কলুষমুক্ত রাখা, সব ধরণের লোভ, স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে নিজের অবস্থান সংহত রাখা এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল ও সৌন্দর্যময় রাখার জন্য সুফিবাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুফিবাদ মানুষকে সত্যিকারের মানুষ তথা 'ইনসানে কামেল' বা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলতে সাহায্য করে। মানব হৃদয়কে প্রকৃত অর্থে এক প্রেমিক হৃদয়ে পরিণত করে সুফিবাদ। আর তাই সভ্য জগতের সর্বত্রই সুফিবাদের রয়েছে ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা ও অনিবার্য উপযোগিতা। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ও সভ্যতার বিকাশে এ মতবাদের রয়েছে অনন্য অবদান।

অলি, সুফি, পির, ফকির, দরবেশ, গাউস, কুতুব ও সাধক হিসেবে যাঁরা আমাদের সমাজে পরিচিত; মূলত তাঁদের মাধ্যমেই সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলা ভূখণ্ডে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বিস্তৃতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সুফিবাদের মহান দীক্ষায় উজ্জীবিত হয়েই তাঁরা আমাদের এতদঞ্চলে ইসলামের শান্তির সুবাতাস বইতে দিকপালের ন্যায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিনয়, ভদ্রতা, নম্রতা আর সাধুতার গুণকে নিজেদের জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে গণ্য করে তাঁরা মানব হিতৈষীরূপে সর্বদা মানব কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন। অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিহার করে তাঁরা জীবনের সাফল্য খুঁজেছেন। ব্যক্তি ইচ্ছা আর ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজের সামষ্টিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তাঁরা ইসলামের কল্যাণ নীতির সফল বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছিলেন। উদার, সহনশীল ও অসাম্প্রদায়িক ইসলামের সুফিবাদী ভাবধারাকে সত্যিকার অর্থে কাজে লাগিয়ে বাংলা ভূণ্ডে প্রতিথযশা অনেক মনীষী এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সুফিবাদের চর্চা ও বিকাশে তাঁরা এতদঞ্চলে নতুন দিগন্তেরও উন্মোচন করেছেন।

বর্তমান আলোচনায় সুদূর অতীত থেকে বাংলা ভূখণ্ডে সুফিবাদ চর্চার ইতিহাস আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ মতবাদের প্রচার-প্রসার, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ পূর্বক এমন খ্যাতিমান সুফিগণের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করা হবে- যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও সাধনার মাধ্যমে বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামের উদার ও অসাম্প্রদায়িক এই সুফি মতবাদের সুফলকে আমাদের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে এক উন্নত, নৈতিক ও সহনশীল সমাজ গড়তে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদ থেকে মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন আর সহায়-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসারে যুগে যুগে বাংলায় আগমন করেন অজস্র সুফি-সাধক, অলি ও গাউস-কুতুব। এঁদের পবিত্র সান্নিধ্যে ও মমতার স্পর্শে বাংলার মানুষ হয়ে ওঠে পারস্পরিক সহানুভুতিশীল, উদার, নৈতিক ও মানবতাবাদী। সুফি-সাধকদের মহান শিক্ষার ফলেই এতদঞ্চলের মানুষ ইসলাম ধর্মের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। এ পর্যায়ে বাংলার মানুষের হৃদয়-মনে, চিন্তা-চেতনায়, স্বভাব-চরিত্রে ও আচার-ব্যবহারে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছেন এমন উল্লেখযোগ্য ক'জন সুফি ধর্মপ্রচারকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও অবদান মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের আগে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যাঁরা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন সেসব নিবেদিত প্রাণ আত্মপ্রচার বিমুখ সুফি ও মুবাল্লিগের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করা হয় তিনি হলেন শাহ সুলতান মাহিসওয়ার (র.)। তাঁর পুরো নাম মির শাহ সৈয়দ সুলতান মাহমুদ বালখি মাহিসওয়ার (র.)। বগুড়া জেলার মহাস্থানে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। তিনি ৪৩৯ হিজরি মোতাবেক ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। শাহ সুলতান বালখি মাহিসওয়ার ও পরবর্তীকালে আরো অনেক অলি-দরবেশের মাজার থাকায় পৌন্ড্রবর্ধনের পরিবর্তে মহাস্থানকে 'মাস্তানগড়' অথবা 'মহাস্থান' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সুফি মাহিসওয়ার মৎস্যাকৃতির বাণিজ্য জাহাজে সমুদ্র পথ অতিক্রম করে বাংলায় আগমন করেন এবং সন্দ্বীপে অবস্থান নেন। অতপর কিছুকাল পর জনাকীর্ণ ঢাকার হরিরামপুর নগরে আসেন এবং হিন্দু রাজা বলরামকে (খ্রি. ১১ শতক) তিনি পরাস্ত করেন। তাঁর অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজার মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মাহিসওয়ার কর্তৃক সিংহাসনে আরোহন করেন। তারপর বগুড়ায় আসেন এবং রাজা পরশুরাম (খ্রি. ১১ শতক) কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিতে আস্তানা গড়ে তোলেন। কিন্তু রাজা পরশুরাম সুফি মাহিসওয়ারের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং নিহত হন। মাহিসওয়ার তাঁর অলৌকিক শক্তি আর আত্মবিশ্বাস ও অসীম সৎসাহসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে প্রবল ক্ষমতাধর অত্যাচারী রাজাদের পরাস্ত করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। ইসলামের বিজয় নিশান উড়াতে পেরেছিলেন। তাঁর সততা, ন্যায় ও ধর্মপরায়ণতা বিজয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি এখনও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

বালখের জনৈক সুলতানের পুত্র দরবেশ মাহিসওয়ার পিতার মৃত্যুর পর সুলতান হন। পরবর্তীতে রাজকীয় বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি অনিচ্ছা ও অনাগ্রহ দেখিয়ে গৃহত্যাগ করে দামেশকের সুফি-সাধক শায়খ তাওফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশে তিনি মাছের আকৃতি বিশিষ্ট এক নৌকাযোগে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে

বাংলায় আসেন। বগুড়ার মহাস্থানে তাঁর সাথে বিবাদে রাজা পরশুরাম নিহত হলে তার তন্ত্রসাধিকা রাজকন্যা রত্নমণি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহাস্থানে আস্তানা গড়ে সুফি মাহিসওয়ার শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও সার্থকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। প্রাচীন প্রাচীর বেষ্টিত মহাস্থান গড়ে তার পবিত্র মাযার (মাহিসওয়ার দরগাহ, স্থানীয় উচ্চতম টিলার উপর) বিদ্যমান। বগুড়ার শিবগঞ্জের এক চৌধুরী পরিবার তাঁর বংশোদ্ভুত বলে দাবি করেন।

বাংলায় আগমনকারী সুফি-দরবেশদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমি (খ্রি. ১১ শতক) অন্যতম। নেত্রকোণা জেলার মদনপুর ইউনিয়নের মদনপুর উপশহরে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এ সুফি-দরবেশ ৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে একশত বিশজন সহচর ও শিষ্য আসেন। শাহ সুলতান রুমি মদনপুর এলাকার তদানিন্তন কোচ-রাজার দরবারে গিয়ে রাজার প্রদত্ত দুষ্পাচ্য মৃত্যু বিষ বিসমিল্লাহ বলে মুখে দিয়ে হাসিমুখে হজম করলে রাজা তাঁর লোকাতীত শক্তি দেখে বিস্মিত হন এবং তাঁর নামে মদনপুরসহ তথাকার এক বৃহত্তর এলাকা যথাবিধি ইজারা পাট্টা লিখে উপহার দেন। ফলে সেখানকার রাজাসহ উপজাতীয় লোকেরা দলে দলে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

শাহ সুলতানের মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিষ্কর সম্পত্তি রয়েছে তার স্বীকৃতি ১০৮২ হিজরীতে (১৬৭১ খ্রি.) বাদশাহ শাহজাহানের (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.) পুত্র বাংলার সুবাদার শাহ সুজা (১৬১৬-১৬৬০ খ্রি.) ফারসি ভাষায় এক সনদ প্রদান করেছিলেন। এই শাহি সনদে তাঁর মুর্শিদসহ ৪৪৫ হিজরিতে (১০৫৩ খ্রি.) মদনপুরে আগমন ও তথাকার কোচ রাজার দেয়া বিষ নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ এবং রাজা কর্তৃক প্রদত্ত সমগ্র গ্রাম উৎসর্গের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শশীভূষণ দাসগুপ্তের (১৯১১-১৯৬৪ খ্রি.) মতে, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সুফি মরমিয়া বাণী বাহকও তিনি। দরবেশ শাহ সুলতান রুমি মদনপুর গ্রামে আস্তানা গাড়েন এবং উক্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তদানিন্তন কোচ রাজা তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে মদনপুর গ্রামের স্বত্ব দান করেন।

শাহ সুলতান রুমির মাযারের আশেপাশে অর্থাৎ মদনপুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মাযারও রয়েছে। তাঁর সহযাত্রী হিসেবে ১২০ জন অলি ছিলেন। সারা জীবন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে এ সুফি-দরবেশ এ অঞ্চলে অমর হয়ে আছেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে সপ্তাহ ব্যাপী তাঁর মাযারে ওরস পালিত হয় আর তাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লাখ লাখ লোকের সমাগম ঘটে।

বাংলাদেশের সুফিগণ মূলত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এদেশে আগমন করেন। অতঃপর তাঁদের অধিকাংশ চট্টগ্রাম ও সিলেটে আস্তানা গেড়ে বসবাস শুরু করেন। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের দিকে সিলেট বিজয়ের মধ্য দিয়ে সুফিগণ আরো বেশি করে এ অঞ্চলে আগমন ও বসবাস করতে থাকেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট অঞ্চল বাংলার সুফিবাদের রাজধানীতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে এখান থেকেই সারা দেশে সুফি মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। সিলেটে আগমনকারী সুফি-সাধকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এমনকি গোটা বাংলাদেশের সুফি-দরবেশগণের মধ্যে যিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন তিনি হলেন হজরত শাহ জালাল ইয়ামেনি (১১৯৬-১৩৪৬ খ্রি.) ।

হজরত শাহ জালাল (রহ.) ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। মরক্কোর তাঞ্জানিয়াবাসী বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮ খ্রি.) ৭৪৫ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা পরিভ্রমণে এসে শাহ জালালের (রা.) সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁর মতে, শাহ জালাল ইয়ামেনি ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অলি। ইবনে বতুতার এই সাক্ষাতের পরের বছরই (১৪ মার্চ ১৩৪৬ খ্রি.) হযরত শাহ জালাল ইন্তেকাল করেন। এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির জন্য বাংলার মুসলমান এই স্বনামখ্যাত সুফি-দরবেশের নিকট ঋণী হয়ে আছেন।

শাহ জালাল ইয়ামেনি শুধু নিষ্ক্রিয় ও স্থাণুর ন্যায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, বরং তিনি একাধারে ধর্মপ্রচারক ও যোদ্ধা ছিলেন। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম আসাম একদিকে যেমন তাঁর রণ-দুন্দুভি-নিনাদে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি তাঁর প্রচার তৎপরতায় মেতে উঠেছিল। এই বিশাল ভূভাগে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামের বীজ বপন করেছিলেন; তাই এখনও বাংলার মুসলমানগণ শত শত পল্লীগাথায় তাঁর স্মৃতি রক্ষা করে চলেছে। সিলেটের তদানিন্তন হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের অমানুষিক অত্যাচারে বুরহানুদ্দিন নামক এক মুসলমান গৌড়ের সুলতানের শরনাপন্ন হলে, সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলভি (১৩০২-১৩২২ খ্রি.) রাজা গৌর গোবিন্দের শাস্তিদানের জন্য সিকান্দার গাজিকে বিরাট বাহিনীসহ সিলেটে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে শাহ জালালও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করেন। ফলে রাজা পলায়ন করেন এবং সিলেট সর্বপ্রথম মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়। শাহ জালাল (র.) ধর্ম প্রচারের জন্য বাকী জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন। ইবনে বতুতা বলেন, ‘এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শাহ জালালের নিকট হতে ইসলামের দীক্ষালাভ করেন এবং এজন্য তিনিও তাদের মধ্যেই বসবাস করেছিলেন।’

ইসলামের চলমান দীর্ঘ পনের শত বছরের ইতিহাসকে সচরাচরভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

১. ধর্মপ্রচার ও বিজয়ের যুগ;

২.সুফি-সাধকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের সম্প্রসারণের যুগ;

৩. রাজনৈতিক পতন ও পুনরুত্থানের যুগ।

মধ্যযুগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলাম ধর্ম বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়। এই যুগের সুফি-সাধকদের প্রেম-ভালবাসা, সেবা ও সাধনার প্রভাবেই ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হয়।

শাহ জালালের জীবনীকারেরা একমত যে, বহু প্রখ্যাত কামিল সুফি-সাধকের মধ্যে তিনি একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফলে ও অক্লান্ত সাধনায় সিলেট, কাছাড়, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম তথা বাংলা-আসামের লাখ-লাখ মানুষ ইসলামের শান্তির ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। তিনি শুধু ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতেন না; বরং তাবলিগে দ্বিন তথা ইসলাম প্রচারের দিকে তাঁর সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ তাঁর খানকায় এসে মুক্তির বাণী শুনতে পেত। ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের বাণী ও শোষণহীন সমাজ

ব্যবস্থা কায়েমের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের পাঠাতেন দূর-দূরান্তে। বাংলাদেশের অন্য কোন সুফি-সাধক তাঁর মত ৩৬০ জন অলি নিয়ে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন বলে তেমন জনশ্রুতি নেই।

যুগস্রষ্টা মুজাদ্দেদ ও সুফি হজরত শাহ জালাল (রহ.) সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে এ মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অনুসারী আউলিয়া-দরবেশদের প্রাপ্য। এ কারণে অনেকে হজরত শাহ জালালকে 'সুলতানে বাংলা' বলে অভিহিত করেন। অবশ্যই আমরা বাংলাদেশকে পূর্ব বাংলার সমাজ ব্যবস্থার সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে যদি বিবেচনা করতে পারি, তবে শাহ জালাল ইয়ামেনিকে এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক গুরু বা নেতা তথা 'সুলতানে বাংলাদেশ' বললে কোন অত্যুক্তি হবে না।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে হযরত সৈয়দ শাহ মাখদুম রুপোস (১৪৭৫-১৫৯২ খ্রি.) চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। রাজশাহী শহরের পাশে, পদ্মা নদীর উত্তর তীরে দরগাপাড়া মহল্লায় তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। তিনি সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) বাংলায় আগমন করেন এবং তৎকালীন মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার, ও অন্ধবিশ্বাসকে দূর করার অভিলাষে আত্ম উৎসর্গ করেছিলেন। বহু উৎপীড়িত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুকেও তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁদেরই সহায়তায় উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

শাহ মাখদুম বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ করতে পারতেন। এটি ছিল তাঁর কারামতের একটি অংশ। আর তাই তিনি 'রূপোশ' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, শাহ মাখদুমের দরগাহ সংক্রান্ত প্রাচীন কাগজপত্রে তাঁকে 'রূপোশ আউলিয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'রূপোশ' ফারসি শব্দ, এর অর্থ ঢাকনা বা অবগুণ্ঠন, অন্য অর্থে ছদ্মবেশী। প্রতি বছর ২৭ রজব তারিখে শাহ মাখদুমের ইন্তেকাল উপলক্ষে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের হাজার-হাজার ভক্ত এই উপলক্ষে শাহ মাখদুমের দরগায় সমবেত হয়ে ফাতেহা পাঠ করে।

বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা ও যশোর এলাকায় পবিত্র ইসলামের প্রচার-প্রসারে অভূতপূর্ব অবদান রেখে যিনি ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন হযরত খানে আযম খান জাহান আলি (মৃ. ১৪৫৯ খ্রি.)। বঙ্গের ইতিহাসে সাধারণত খান জাহান আলি এবং দক্ষিণ বঙ্গের জনগণের মধ্যে পির খাঞ্জালি নামে তিনি সমধিক পরিচিত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোর, খুলনা ও সুন্দরবন অঞ্চলের ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংগঠক, সুশাসক ও স্থপতি হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রাথমিক ও পারিবারিক জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁর মাযারের শিলালিপি হতে তাঁর প্রকৃত নাম, সময়কাল ও কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। শিলালিপির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ:

আল্লাহর নগন্য দাস, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের করুণা প্রত্যাশী, প্রেরিত পুরুষগণের নেতার বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলেমগণের বন্ধু, কাফের ও মুশরেকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, উলুগ খান-ই-জাহান (তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) ৮৬৩ সালের ২৬ জিলহজ্ব (২৫ অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রি.)

বুধবার রাতে এ নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চিরস্থায়ী আবাসভূমিতে প্রস্থান করেন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখে তিনি সমাহিত হন।

খান জাহানের মাযারে অন্য একটি শিলালিপির বাংলায় ভাষান্তর করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

এই কল্যাণময় উদ্যানটি জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি। মহান খান, খানে জাহানের করুণা ও সন্তুষ্টি তাঁর উপর বর্ষিত হোক। এটি লিখিত হয় ৮৬৩ সালের ২৭ জিলহজ্ব মোতাবেক ২৬ অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে।

বড়পির আবদুল কাদের জিলানি (১০৭৭-১১৬৬ খ্রি.)-এর বংশধর খান জাহান আলি (র.) সুদূর তুরস্ক থেকে প্রথমে দিল্লী ও পরে গৌড়ে এসে বসবাস করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য পরবর্তীতে তিনি গৌড় থেকে এদেশে (খুলনার বাগেরহাট) আগমন করেন। খান জাহান সেখানে সর্বপ্রথম আস্তানা গেড়েছিলেন তার নাম হয় খাঞ্জেপুর। এখানে তিনি একটি শহর নির্মাণ করেন। নদীর পাশেই তিনি নির্মাণ করেন তাঁর বাসস্থান, দরবার ঘর ও মসজিদ। খান জাহানের সাথে আরো এগার জন অলি ছিলেন। তাঁকেসহ মোট বার জন অলির অবস্থানের জায়গাটিকে স্থানীয় লোকেরা 'বার আউলিয়ার বাজার' বলতো। পরবর্তীতে তাই সংক্ষিপ্ত হয়ে 'বার বাজার' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। খান জাহান কর্তৃক নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদসহ ঘোড়া দীঘি, বদর দীঘি, পাচু দীঘি, খাঞ্জালি দীঘি, বাসভবন, নয় গম্বুজ মসজিদ, কড়ের মসজিদ এবং বিভিন্ন নামে রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি মানুষ ও মানবতার জন্যে তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে আছে। তিনি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে মানুষের বাসের উপযোগী করে তোলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ও নির্দেশে দলে দলে লোক নানা জনহিতকর কাজে আত্মোৎসর্গ করে। বিনা রক্তপাতে সুন্দরবন অঞ্চল জয় করে তিনি সেখানে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর প্রকৃত সুফি-দরবেশ হিসেবে তাঁর মধ্যে এসব গুণ দেখে অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

মহান সাধক ও শাসক খান জাহান আলি দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থেকে শেষ জীবনে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকতেন এবং বাগেরহাটের সন্নিকটে স্বীয় মাযার জীবদ্দশায়ই নির্মাণ করেন। মাযারের পাশেই প্রায় সমআয়তনের একটি মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদেই তিনি মোরাকাবা-মুশাহাদায় মগ্ন থাকতেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মাযারে উৎকীর্ণ অপর একটি ফারসি শিলালিপির বাংলা ভাষান্তর নিম্নরূপ:

'বন্ধুগণ! স্মরণ রেখো, মৃত্যু নিশ্চয়ই সত্য, মৃত্যু নিশ্চয়ই সত্য;
কুসুম-কানন কণ্ঠকাকীর্ণ, মৃত্যু নিশ্চয়ই সত্য, মৃত্যু নিশ্চয়ই সত্য;
মৃত্যু প্রবল শত্রু, সকল প্রত্যয়বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওঁৎ পেতে আছে;
অন্য কোন শত্রুর সমতুল্য নয়, মৃত্যু নিশ্চয়ই সত্য, মৃত্যু নিশ্চয়ই সত্য।
বাংলাদেশে ইসলামি উচ্চ শিক্ষা এবং হাদিস শিক্ষার প্রসারের জন্য মূলতঃ যিনি প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনিই হলেন খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম, মুহাদ্দেস, শিক্ষা সংগঠক, কামেল ও সুফি শায়খ শারাফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (র.)। পারস্যের বুখারা নগরীতে আনুমানিক ১২১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনের

সূচনাও হয় বুখারাতেই। বুখারা ছিল তদানিন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদিস চর্চা কেন্দ্র। সেখানকার শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান প্রাজ্ঞ মুহাদ্দেসগণের নিকট হতেই তিনি হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। খুরাসানের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রেও তিনি অধ্যয়ন করেন। জ্ঞান আহরণে তাঁর প্রভূত আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পবিত্র কুরআন, তাফসির, হাদিস, ফিক্হ, উসুল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জাদু বিদ্যা, রসায়নসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করেন। এসবের পাশাপাশি তিনি তাসাউফ শাস্ত্র তথা ইসলামের অধ্যাত্মবাদেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের সময় ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন। বেশ কিছুকাল বিহারে অবস্থান করে তিনি ১২৭০ সালে বাংলার তদানিন্তন রাজধানী সোনারগাঁ-এ চলে আসেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হয় এক বৃহৎ ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র, যা তদানিন্তন মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠানে এসে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতো।

শারাফুদ্দিন আবু তাওয়ামা একাধারে মুহাদ্দেস ও সুফি ছিলেন। তিনি ১৩০০ সালে সোনারগাঁ-এ নিজ বাসবভনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবনাবসানের পরও প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত এ ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র বহাল থেকেছিল। অতঃপর তত্ত্বাবধানের অভাবে সময়ের ব্যবধানে কালের আবর্তে নিপতিত হয়ে তা বিলীন হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ড. এম এ রহিম উল্লেখ করেন :

> ‘Sonargaon was a lively seat of learning from the later years of the thirteenth century. It began under the propitious patronage of the renowned scholar Maulana Sharf-al-Din Abu Tawwama. Maulana Abu Tawwama founded this seminary of advanced Learning and devoted his life to teaching at his place. His renown as a scholar attracted students form far and near.’

প্রাচীন সোনারগাঁ পির-দরবেশ ও সাধু-সুফিগণের তাসাউফ সাধনায় উচ্চমার্গে পৌঁছেছিল। সেকালের বাংলা তথা সোনারগাঁয়ে দরবেশগণের মধ্যে শায়খ শারাফুদ্দিন আবু তাওয়ামার নাম উল্লেখের দাবি রাখে। দু’জন প্রখ্যাত দরবেশ উত্তরবঙ্গের শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযি ও পূর্ববঙ্গের হযরত শাহ জালাল; এঁদের মতো মধ্য বাংলায় ছিলেন হযরত শারাফুদ্দিন আবু তাওয়ামা- যিনি সাধনা ও চরিত্র মাধুর্যে ইসলামের ললিত বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। তাঁর প্রভাব বাংলার বাইরেও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল। তিনি ‘তাসাউফের মক্কামাত’ শীর্ষক সুফিবাদ সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন; যা সেকালে সমগ্র উপমহাদেশে প্রশংসা অর্জন করে।

ঐতিহাসিক বৃহত্তর বাংলায় সুদূর অতীত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদ হতে ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং সুফিবাদের ক্রমবিকাশের ধারায় বহু সুফি-দরবেশের আগমন ঘটে। তাঁদের মধ্যে শাহ সুরখুল আম্বিয়া (আগমন ১০৫৩ খ্রি.), বাবা আদম শহিদ (খ্রি. ১২ শতক), শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি (জন্ম ১২৬৩ খ্রি.), আব্বাস আলি মাক্কি ওরফে পির গোরাচাঁদ (জন্ম ১২৬৫ খ্রি.), রওশন আরা মাক্কি (১২৭৯-১৩৪২ খ্রি.), তাকিউদ্দিন আল আরাবি (মৃ. ১২৯১ খ্রি.), মাখদুম শাহদৌলা শহিদ (খ্রি. ১৩ শতক), শাহ জালালুদ্দিন তাবরিযি (মৃ. ১৩৩৭ খ্রি.), শাহ নেয়ামতুল্লাহ (খ্রি. ১৪ শতক), শায়খ আবদুল্লাহ কেরমানি (মৃ. ৯৫৫ হি.), আখি সিরাজুদ্দিন (মৃ. ১৩৫৭ খ্রি.), জালালুদ্দিন জাহান গাশ্ত (মৃ.

১৩৮৩ খ্রি.), আলাউদ্দিন আলাওল হক (১৩০১-১৩৯৮ খ্রি.), শাহ বদর (খ্রি. ১৪ শতক), শাহ পির বদরুদ্দিন (খ্রি. ১৫ শতক), শাহ মোহাম্মদ বাগদাদি (খ্রি. ১৪ শতক) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও আরো অনেক সুফি-সাধক বাংলায় আগমন করেন। পূর্বে সিলেট-চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে বর্ধমানের মঙ্গলকোট এবং দক্ষিণে বাগেরহাট ও ছোট পাণ্ডুয়া থেকে উত্তরে দিনাজপুর জেলার কাঁটাদুয়ার পর্যন্ত সুবিশাল এলাকা ছিল তাঁদের কর্মক্ষেত্র।

৪. বাংলাদেশে মাজার ও সুফি সংস্কৃতির উপর আঘাত

বাংলাদেশে গত ১১ মাসে (আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫) ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, নরসিংদি, কুমিল্লা, খুলনা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, রাজশাহী, শরিয়তপুর, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালি, গাজীপুর, মাদারিপুর, ফেনী, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নাটোর, পঞ্চগড়, কক্সবাজার, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, বরগুনা, ঠাকুরগাও ও নেত্রকোণাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মাজার ও সুফি সংস্কৃতির ওপর এক ব্যাপক ও চিন্তান্বিত নানাবিধ হামলা ঘটেছে। নিচে তার সারমর্ম তুলে ধরা হলো:

৪.১. হামলার পরিসংখ্যান ও ধরন

- ৪ আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১২০টির মতো হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ৮০টির মতো সুফি মাজার, দরবার শরিফ ও কবীরাজি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- এ হামলাগুলোর মধ্যে ছিল:
    - **৪.১.১.** ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট;
    - **৪.১.২.** মাজার এবং সেই প্রতিষ্ঠিত স্থানে অবস্থিত জনসাধারণ বা সুফি-অনুসারীদের ওপর উগ্রবাদীদের আক্রমণ;
    - **৪.১.৩.** মাজার ও সুফি কেন্দ্রসমূহে অনেক জায়গায় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়;
    - **৪.১.৪.** বিভিন্ন মাজারে সংগীত, কাওয়ালি ও বাউল উৎসবকে মৌলবাদী গোষ্ঠী অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি;
    - **৪.১.৫.** অনেক জায়গায় সুফি, পীর ও দরবেশগণের কবর পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে;
    - **৪.১.৬.** হামলা ও ভাংচুরে কোথাও কোথাও বুলডোজার ব্যবহার করা হয়; যা সরকারি প্রশ্রয় ব্যতিত অসম্ভব;
    - **৪.১.৭.** দেশের কোনো কোনো মাজার ও সুফি কেন্দ্রে একাধিকবার হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে;
    - **৪.১.৮.** অনেক জায়গায় গদিনশীন পীর, খানকার তত্ত্বাবধায়ক ও সুফি কেন্দ্রের খাদেমদের উপরে হুমকি, আক্রমণ ও প্রাণনাশের ভীতি সঞ্চার করা হয়;

- **৪.১.৯.** বহু মাজার ও সুফি কেন্দ্রের পরিচালনায় উগ্রবাদী হামলাকারীরা হস্তক্ষেপ করে জোরপূর্বক হয় দখল-স্বত্ত্ব কায়েম করে নতুবা চাঁদা আদায় করে তদারকির ভার নেয়।

৪.২. আঞ্চলিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	হামলার সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ	৩৫ টি
চট্রগ্রাম বিভাগ	৩০ টি
ময়মনসিংহ বিভাগ	১৫ টি
অন্যান্য স্থানে	৪০টি

শেরপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নরসিংদি, ময়মনসিংহসহ নানা জায়গায় একই মাজারে একাধিকবার করে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

৪.৩. গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট ঘটনা

নিচে আগস্ট ৫, ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সময়কালে বাংলাদেশে মাজার ও সুফি কেন্দ্রের উপর সংঘটিত আক্রমণসমূহের কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

- ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে চুয়াডাঙ্গার সৈয়দ রেজা শাহ চিশতির মাজারে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটে। এ হামলায় মাজার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। একইদিনে নারায়ণগঞ্জের সৈয়দ রেজা সারওয়ারের মাজার ও কুমিল্লার লাকসামে আশরাফনগর দরবার শরিফসহ দেশের অন্যান্য স্থানেও মাজারে হামলা হয়;
- ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সিরাজগঞ্জ সদরের ইসমাইল পাগলার মাজারে হামলা করে। হামলায় কবরটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরদিন নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে দেওয়ানবাগ খানকায় হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়, এ হামলায় অনেকেই আহত হন। পুরো সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক মাজারে হামলার ঘটনা চলতে থাকে;
- ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে রশিদিয়া দরবার শরিফে আক্রমণ করা হয়;
- ময়মনসিংহের তারাকান্দায় শাহ আবদুর রহমান ভাণ্ডারির মাজারে হামলার ঘটনা ঘটে ৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে, একই মাসের ১৮ তারিখে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে পূর্ব আনোয়ারপুর গ্রামে আয়োজিত ধর্মীয় সংগীতের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয় উগ্রবাদীরা;
- ২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহের নান্দাইলে শাহ আমান পাগলার মাজারে হামলা ও ভাংচুর করে; ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ঢাকার হজরত খাজা শাহবাজ (রাহ.)-এর মাজারে হামলা করে এবং কবরটা ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। শেরপুরে— দু'বারে (২৬ ও ২৮ নভেম্বর ২০২৪) খাজা বদরুদ্দোজা হায়দার

ওরফে দোজা পিরের মাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে; এতে একজন আহত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন (হাফিজ উদ্দিন) এবং আরো ১৩ জন আহত হয়। পুরো নভেম্বর মাসজুড়েই চলতে থাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকা মাজারগুলোতে হামলা ও আক্রমণের ঘটনা;

- ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নাটোর সদর উপজেলার তেবাড়িয়া ইউনিয়নের লোচনগড় গ্রামের আল চিশতী মাজারে আয়োজিত বাউল উৎসবের প্যান্ডেল ভাঙচুর করেছে উগ্রবাদীরা। মাজার কমিটি সূত্র জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও মাজার চত্বরে বাউল সংগীতের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে প্যান্ডেল নির্মাণসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু উগ্রবাদীরা অনুষ্ঠানস্থলের প্যান্ডেল ভাঙচুর করে তছনছ করেছে। এতে সংগীতানুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়;
- ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহের হযরত শাহ সুফি কালু শাহ (রাহ.)-এর মাজারে উরস চলাকালে আক্রমণ চালায় এবং কাওয়ালি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ১০ জানুয়ারি পঞ্চগড়ের হজরত মুজিবুর রহমান এর মাজারে হামলা করে কবর গুঁড়িয়ে দেয়-(.রাহ)। ২৪ জানুয়ারি নরসিংদি সদরের শাহ সুফি আইয়ুব আলি শাহ এর মাজারে এবং একইদিনে নরসিংদির হজরত মোহাম্ম-(.রাহ)দ আলি মুন্সির মাজারে হামলা করা হয়;
- ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে গাজিপুরের শ্রীপুরে হেরাবন পাক দরবার শরিফে আক্রমণ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের মধুপুরে লালন স্মরণোৎসব উগ্রপন্থীরা বন্ধ করে দেয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালির চাটখিলের হজরত মধু দরবেশের মাজার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের পেকুয়ায় হজরত সৈয়দ শায়ের মোহাম্মদ আল কাদেরি আল চিশতির মাজারে আক্রমণ চালিয়ে ভাংচুর করে। এ মাসে আরো নানান স্থানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে মানিকগঞ্জের সিংগাইরে বাউল সম্রাট রশিদ বয়াতির বার্ষিক উরস অনুষ্ঠানে হামলা চালায় এবং পুরো আয়োজন পণ্ড করে দেয়।

৪.৫. সরকারের প্রতিক্রিয়া ও আইনানুগ উদ্যোগ

- অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নামমাত্র 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করা হয়, এবং পুলিশকে দ্রুত অপরাধ তদন্ত ও সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার ত্বরান্বিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এটি শুধু ঘোষণা ও নির্দেশের পর্যায়েই থাকতে দেখা গেছে; মূলত কার্যকর ও দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি;
- ১৫টি সাধারণ মামলা ও ২৯টি জেনারেল ডায়েরি (GD) দায়ের করা হয়, এবং ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করে; এরমধ্যে মাত্র দুইটি মামলার চার্জশিট আদালতে পাঠানো হয়;
- একই সঙ্গে শান্তি বৈঠক, ধর্মীয় ও ইসলামি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সভা ও মতবিনিময়, কমিউনিটি পুলিশিং ইত্যাদি উদ্যোগ রাখা হয়েছে।

৪.৬. সামাজিক প্রতিক্রিয়া, সমালোচনা ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবাদ

- Justice Makers Bangladesh in France (JMBF) রিপোর্ট করে যে ৬ মাসে ১০০টিরও অধিক মাজারে হামলা চালানো হয়েছে এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রশাসনের দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে।

- Global Sufi Organization জানায়, বিগত ৬ মাসে ৮০টিরও অধিক মাজার ও সুফি কেন্দ্র (darbar sharif) আক্রমণের শিকার হয়েছে। তারা:
    - ন্যায়বিচার ও আদালতি তদন্ত,
    - সংস্কার-সচেতনতা,
    - ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ও পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন ।
- Justice Makers Bangladesh in France (JMBF) মিডিয়া বিবৃতিতে:
    - ২৬–২৮ নভেম্বর ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ময়মনসিংহ, নাটোর, শেরপুরে সংঘটিত হামলা–অগ্নিসংযোগকে সামগ্রিকভাবে দায়মুক্ত না রেখে আন্তর্জাতিক নজরদারি ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে।
- Reddit-এ স্থানীয় ব্যবহারকারীরা উল্লেখ করেছেন:

    > "Over the past six months, Islamists in Bangladesh have attacked over 80 Sufi shrines, burning, looting, and even killing followers..."
    >
    > "...Over 80 shrines were attacked by conservative Muslims in last 6 months and the Interim government hasn't made any single arrest."

- অনেকেই বলছেন, সরকারি "জিরো টলারেন্স" ঘোষণার পরও কার্যত গ্রেপ্তার ও ন্যায্য বিচার হয়নি ।

৪.৭. মূল্যায়ন

- অন্তবর্তীকালীন সরকারের মাত্র ১১ মাসে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের একটি অনন্য রূপ সৃষ্টিকারী সুফি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী, সংগঠিত এবং রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিকভাবে উদ্বুদ্ধ হামলার প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছে;
- সরকারি প্রশাসন ও বৈধ কাঠামো প্রতিক্রিয়া ও অপ্রতুল আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, বহুল সংখ্যক ঘটনা ঘটার পরেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল বা স্বাভাবিক হয়নি;
- এমতাবস্থায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষায় গণসচেতনতা, নিরাপত্তা ও দ্রুত তদন্ত ব্যবস্থা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.৮. হামলার প্রকৃতি ও ধারাবাহিকতা

- হামলাগুলোতে ছিল দর্শনার্থী ভাঙচুর, মাজার ও ওরস উৎসবের আয়োজন বিঘ্ন, এছাড়াও ভক্তদের ওপর আক্রমণ, দানবাক্স লুট, পট্টি-পট্টি মদের জ্বালিয়ে দেয়া অন্তর্ভুক্ত;
- Global Sufi Organization এবং দেশের তরিকতপন্থী অন্যান্য সংগঠন সূত্রে জানা যায়, গত ১১ মাসে দেশের অন্যুন ৮০টিরও বেশি মাজার/সুফি কেন্দ্র আক্রমণের শিকার হয়েছে;
- এসব আক্রমণ এখনো চলমান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমনে ভীতি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে;

- বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সুন্নি আলেমসমাজ এসব হামলার বিষয়ে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন;
- বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিজনরা এসব ইস্যুতে আপাতত মুখ না খুললেও অঞ্চলভিত্তিক সাধু, বাউল ও কাওয়ালি শিল্পীসহ সমাজের নানান শ্রেণি-পেশার মানুষজন উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে না হলেও কোথাও কোথাও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং এসব হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছেন।

৪.৯. উল্লেখযোগ্য নির্দিষ্ট আরো ঘটনার বিবরণ

- শাহ সুফি আয়ূব আলী দরবেশ (নোয়াখালী) — ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ হামলাটি তৌহিদি জনতা নামধারী এক গোষ্ঠীর বলে অভিযোগ রয়েছে;
- বরগুনা শহরের এক মাজারে ১৬ মার্চ ২০২৫ রাতে উরস অনুষ্ঠানে হামলা হয়েছে। এতে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে; তাঁবু, মিলাদ মঞ্চে আগুন ও লুটপাট চালানো হয়েছে;
- সিলেটে হজরত শাহ পরান (রাহ.)-এর মাজারে ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ও চট্টগ্রামে অবস্থিত হজরত বায়েজিদ (রাহ.)-এর মাজার গত ২৮ নভেম্বর, ২০২৪-এ হামলার শিকার হয়। এ হামলায় বড় ধরনের ভাঙচুর করা হয় ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

৪.১০. সার্বিক বিশ্লেষণ ও চ্যালেঞ্জ

- এসব হামলার সংখ্যাগত তালিকা ও ধারাবাহিকতা বোঝাচ্ছে যে, এগুলো একটি সংগঠিত, ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত দমনমূলক কর্মকাণ্ড; যার উদ্দেশ্য হলো সুফি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে হ্রাস করা;
- সরকারি পদক্ষেপ ও আইন প্রয়োগ সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়নি, মামলার অগ্রগতি ধীর এবং মানুষ অভিযোগ করতেও ভয় পাচ্ছে;
- সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো নিরপেক্ষ বিচার, ক্ষতিপূরণ ও সাংস্কৃতিক সংহতির আহ্বান জানিয়েছে।

৪.১১. সংক্ষিপ্ত সারাংশ

- গত কয়েক মাসে ১২০টির মতো হামলা: ৮০টির বেশি মাজার ও দারবারে আঘাত;
- অঞ্চল ভিত্তিক হামলা: ঢাকায় সর্বাধিক, তারপর চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদি;
- হামলার ধরন: ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভক্তদের উপর নির্যাতন;
- সরকারি পদক্ষেপ: 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা, মামলা ও গ্রেপ্তার কিছু হলেও বিচার প্রক্রিয়া অপ্রতুল;
- সমাজ ও অধিকার সংস্থার প্রতিক্রিয়া: স্বচ্ছ বিচার, নিরাপত্তা, সংস্কারের দাবি তীব্র।

৫. বাংলাদেশে সুফি-সংস্কৃতি

বাংলাদেশে সুফি সংস্কৃতি (Sufi Culture) হলো ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক ও মানবিক ধারা, যা ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত এবং সাধনার মাধ্যমে সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি মূলত আত্মশুদ্ধি, ভালোবাসা, সহনশীলতা, ও আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পথ অনুসরণ করে। নিচে বাংলাদেশের সুফি সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বিশদ আলোচনা তুলে ধরা হলো:

৫.১. সূচনালগ্ন ও ইতিহাস

- সুফিবাদ বাংলাদেশে আসে ১৩শ থেকে ১৪শ শতকে, মূলত আরব, পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত সুফি সাধক ও অলিদের মাধ্যমে;
- সুফিরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারক, যারা সমাজে মানবতা, প্রেম ও সহিষ্ণুতার বার্তা ছড়িয়েছেন;
- চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচুর সুফি দরবেশ ও অলিদের মাজার গড়ে ওঠে।

৫.২. বিশিষ্ট সুফি সাধক:

- হজরত শাহ জালাল (রাহ. — সিলেটের অন্যতম শ্রদ্ধেয় অলি ও দরবেশ;
- হজরত শাহ সুলতান রুমি (রাহ.)— নেত্রকোণার মদনপুরে অবস্থিত তাঁর মাজার, যিনি বঙ্গে আগমনকারী ইতিহাসের প্রথম সুফি;
- হজরত খানজাহান আলি (রাহ.)— খুলনার বাগেরহাটে তাঁর ঐতিহাসিক মসজিদ ও মাজার (ষাটগম্বুজ মসজিদ);
- হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রাহ.)— রাজশাহীর প্রখ্যাত সুফি ও কুতুব।

৫.৩. সুফি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য

দিক	বর্ণনা
তরিকত	আত্মশুদ্ধির সাধনা, পীর-মুরিদ সম্পর্ক ও চিশতিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া প্রভৃতি তরিকা অনুসরণ
মাজার সংস্কৃতি	অলিদের কবর বা দরবার শরিফকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উৎসব, উরস, মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন
সাংস্কৃতিক ধারা	কাওয়ালি, বাউল গান, গজল — এগুলো সুফি চেতনা ও প্রেমদর্শনের বাহক
সামাজিক ভূমিকা	দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা, দান, ভক্তি, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও আন্তধর্মীয় সংহতির প্রচার

৫.৬. সুফি সাহিত্য ও সংগীত

বাংলাদেশের সুফি সংস্কৃতি মূলধারার বাংলা সাহিত্য ও সংগীতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে:

সাহিত্য:

- লালন ফকির: ঈশ্বর, মানবপ্রেম ও আত্মসন্ধানের সুফি-দর্শনে ভরপুর;
- হাছন রাজা, জালাল উদ্দিন খান, দুদ্দু শাহ – বাউল ও সুফি প্রভাবিত কবি;
- এঁদের রচনায় দেহতত্ত্ব, রহস্যবাদ ও আল্লাহপ্রেম গুরুত্ব পায়।

সংগীত:

- কাওয়ালি ও গজল: উরস ও দরবারে গাওয়া হয়;
- বাউল গান: সুফি চেতনার বহিঃপ্রকা;।
- লালনের গান, যেমন: "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?" এখানে মানবতাবাদী সুফি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়।

৫.৭. মাজার ও উরস সংস্কৃতি

- প্রতিটি সুফি সাধকের মাজারকে ঘিরে বার্ষিক উরস শরিফ আয়োজন করা হয়। এতে সারাদেশ থেকে হাজারো ভক্ত জড়ো হয়ে থাকেন;
- মাজারে থাকে:
    - মিলাদ, কাওয়ালি, গজল;
    - তবারুক বিতরণ, মান্নত, দান ইত্যাদি।
- এটি একদিকে ধর্মীয়, আবার অপরদিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক মিলনমেলা।

৫.৮. সুফি সংস্কৃতির আধুনিক প্রভাব

- এখনও গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে বহু মানুষ সুফি মাজারে যান মানসিক শান্তি, দোয়া ও চিকিৎসার আশায়;
- তরুণদের মাঝে সুফি গানের জনপ্রিয়তা বেড়েছে— যেমন কাওয়ালি, ফিউশন সুফি গজল ইত্যাদি;
- টেলিভিশন ও ইউটিউবেও অনেক সুফি সঙ্গীত শিল্পী সক্রিয় রয়েছেন।

৫.৯. সুফি সংস্কৃতি ও চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে সুফি সংস্কৃতি কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে:

- অনেকেই একে "বিদআত" বা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বাইরে বলে দাবী করে;
- উগ্রপন্থীরা সবসময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে ক্ষমতাসীনদের মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতার;
- এরই ধারাবাহিকতায় আগস্ট পটপরিবর্তনের পর গত ১১ মাসে দেশের অনেক মাজারে হামলা হয়েছে;

- তথাপি সাধারণ জনগণের মাঝে মাজার ও সুফি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা এখনো অটুট রয়েছে।

৫.১০. মূল্যায়ন

বাংলাদেশের সুফি সংস্কৃতি হলো:

ইতিহাসের ধারায় গভীরভাবে প্রোথিত,
মানবতাবাদ ও ভালোবাসার দর্শনে সমৃদ্ধ,
সংগীত, সাহিত্য, ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন,
আজও যা এদেশের সামাজিক সংহতির এক শক্তিশালী মাধ্যম।

৬. সুফি সংস্কৃতির নানা দিক: "পীর-মুরিদ" সম্পর্ক

- সুফি তরিকাতে পীর (গুরু) ও মুরিদ (শিষ্য)-এর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- মুরিদরা পীরের নির্দেশনা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সাধনা করেন;
- এটি শুধু আধ্যাত্মিক নয়, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে;
- বঙ্গীয় অঞ্চলে বিগত হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে পীর-মুরিদি প্রথা চালু রয়েছে;
- সুফি-সাধকেরা সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে অনেকেই ইসলাম প্রচারে এই অঞ্চলে এসেছেন;
- পীর-সুফিরা মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও নির্লোভ চিত্তের শিক্ষা দিয়েছেন;
- তাঁরা উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী দর্শন প্রচার করেছেন;
- বঙ্গে ইসলাম এসেছে পীর, গাউস, কুতুব ও সুফিদের হাত ধরে;
- তাঁরা খানকা গড়েছেন এবং মানুষকে ইসলামের শান্তির পথ বাতলে দিয়েছেন;
- এসব খানকার রয়েছে ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব;
- খানকাহ শরীফ ও দরবারগুলোতে নিয়মিত বৈঠক, জিকির ও দোয়ার অনুষ্ঠান হয়;
- বর্তমানে বাংলাদেশে এসব খানকা ও সুফি কেন্দ্রগুলো রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে।

৬.১. খানকাহ ও তরিকতের নির্দিষ্ট কেন্দ্র

- খানকাহ: সুফিদের সাধনার স্থান, যেখানে তারা একান্তে জিকির, ধ্যান, ও তালিমে মশগুল থাকেন।
- বাংলাদেশে অনেক তরিকার খানকাহ রয়েছে। যেমন:
    - কাদরিয়া তরিকার খানকাহ;
    - চিশতিয়া তরিকার খানকাহ;
    - নক্সবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খানকা;
    - উপরিউক্ত প্রধান তরিকাসমূহের খানকাহ ছাড়াও আরো অনেক তরিকার খানকাহ এদেশে বিদ্যমান আছে। এগুলো এখনও তরিকতের অনুসারীদের কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে স্বীকৃত।

৬.২. সুফি দর্শনে 'আত্ম-অনুসন্ধান' (Self-Realization)

- সুফি ভাবনায় মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে আত্মা বা রূহ;
- দুনিয়াবি মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি প্রেমে আত্মনিয়োগই সুফির মূল সাধনা;
- এই ধারায় দেহতত্ত্ব ও রুহানিয়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা লালন-হাছন-দুদ্দু শাহদের রচনায়ও স্পষ্ট।

যেমন লালন বলেন:
"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি"— যা সরাসরি আত্মজ্ঞানকেই গুরুত্ব দেয়।

৬.৩. সুফি সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ

- সুফি সংস্কৃতিতে নারীকে "রুহের সত্তা" হিসেবে দেখা হয়, যিনি প্রেম ও ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে পারেন;
- অনেক মাজারে নারী ভক্তদের জন্য পৃথক আসন ও আলাদা দোয়ার স্থান রাখা হয়;
- কিছু সুফি দরবেশ নারীদের জন্য বিশেষ 'জিকির-মাজলিস' পরিচালনা করে থাকেন।

৬.৪. আন্তধর্মীয় সহাবস্থান ও সহিষ্ণুতা

- সুফি অলিরা কেবল মুসলমানদের নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য মাজার ও সুফি কেন্দ্রগুলোকে উন্মুক্ত রেখেছেন;
- সুফি ও কুতুবদের রচনায় "মানুষ"-এর গুরুত্ব সর্বাগ্রে এবং সেটি ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে।

উদাহরণ: হজরত শাহ সুলতান (রাহ.) ও হজরত শাহ জালাল (রাহ.)-এর মাজার ও দরগায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী মানুষদেরও ভক্ত হিসেবে মান্নত করতে দেখা যায়।

৬.৭. সুফি উৎসব ও অর্থনীতি

- মাজার ও সুফি কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক;
- উরস, দরবার শরীফের বার্ষিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি থেকে স্থানীয় অর্থনীতি লাভবান হয়;
- দোকানপাট, হোটেল, ফুল-বেচা, পীর-মুরিদি ও নানান পণ্যের বিক্রি ইত্যাদি মাজার-কেন্দ্রিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬.৮. সুফি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আধুনিক চ্যালেঞ্জ

- মানবজীবন ও কোনো সমাজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য সুফি সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য;
- বর্তমান বাংলাদেশে উগ্রবাদীদের জন্য এই সংস্কৃতি অনেকটাই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী;

- কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী সুফি সাধনাকে "বিধর্মী" বা "বিদআত" বলে দমন করতে চায়;
- এরই অংশ হিসেবে সামাজিক মাধ্যমে সুফি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা চলে;
- এসবের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে অনেক মাজার, সুফি কেন্দ্র, খানকাহ ও দরবার শরিফ হামলার শিকার হচ্ছে।

৬.৯. সুফি চেতনার আধুনিক রূপ

- সুফি আদর্শ ও সংস্কৃতি সময়ের পরীক্ষায় সর্বদাই উত্তীর্ণ;
- সুফি সংস্কৃতিতে মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলো চর্চিত হয়ে থাকে;
- সুফি সংস্কৃতির সর্বজনীনতার কারণে এটি আধুনিক মনমনস্ক তরুণদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে;
- তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ফিউশন, সুফি মিউজিক, মডার্ন কাওয়ালি দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে;
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুফি দার্শনিকতা নিয়ে পেজ, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল গড়ে উঠছে;
- অনেক তরুণ পীর-আধ্যাত্মিক গাইড খুঁজে নিচ্ছেন অনলাইন মারফতে।

৬.১০. সুফিবাদের সর্বজনীন বার্তা

- সুফি সংস্কৃতি শুধুমাত্র ধর্ম নয়, একটি আধ্যাত্মিক ও মানবিক জীবনদর্শন।
- এর মূল বার্তা:

> "ভালোবাসো — নিজের আত্মাকে, মানবতাকে ও আল্লাহকে।"

৭. মাজারে হামলার কুফল

মাজার ও সুফি সংস্কৃতির ওপর হামলার ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সহাবস্থানে বহুপ্রকার কুফল বা নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে পারে। নিচে এসব কুফল বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হলো:

৭.১. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিলুপ্তি

- মাজার, খানকাহ ও দরবার শরিফ শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, বরং তা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ;
- হামলার ফলে বহু পুরোনো স্থাপনা, ঐতিহাসিক নিদর্শন, দুলর্ভ হস্তলিখিত পুঁথি ও শিল্প-নকশা বিনষ্ট হয়;
- ফলে সুফি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতা হুমকির মুখে পড়ে।

৭.২. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির ভাঙন

- মাজারগুলি সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল, বিশেষ করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্যেও শ্রদ্ধার স্থান ছিল অনেক সুফি অলির মাজার;
- এ স্থানে হামলা মানে সৌহার্দ্য ও বহুসাংস্কৃতিক সহাবস্থানের উপর আঘাত;
- এর ফলে সমাজে সম্প্রীতির পরিবর্তে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে।

৭.৩. মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার ক্ষতি

- হাজারো মানুষ মাজারে মানসিক শান্তি, মান্নত, দোয়া ও আধ্যাত্মিক আশ্রয় খুঁজে পান;
- হামলা এই আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থলগুলোর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতা নষ্ট করে দেয়;
- মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, ফলে ধর্মচর্চা ও সামাজিক সংযোগ ব্যাহত হয়;
- এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও হানাহানি বৃদ্ধি পাবে।

৭.৪. সামাজিক অস্থিরতা ও সহিংসতা

- মাজারে হামলা প্রতিশোধ, প্রতিবাদ ও সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে, যা সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি;
- একপক্ষ সুফি চর্চার পক্ষে, আরেক পক্ষ বিরোধিতা করলে ধর্মীয় বিভাজন, গোষ্ঠীগত সহিংসতা সৃষ্টি হয়;
- পুলিশের হস্তক্ষেপে নাগরিক স্বাধীনতাও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

৭.৫. স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষতি

- অনেক দরবার শরিফ কেন্দ্রিক উরস, মিলাদ, খাদ্য বিতরণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম (হোটেল, দোকান, জারদারি, তসবিহ ইত্যাদি) চলে;
- হামলার ফলে ওই এলাকার ছোট ব্যবসায়ী ও কর্মজীবীদের আয়ের উৎস নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

৭.৬. ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় চরমপন্থার প্রসার

- হামলার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী চায় সুফিবাদকে "বিদআত" বা অবৈধ আখ্যা দিয়ে ইসলামের আদি-সহনশীল রূপকে বিলুপ্ত করতে;
- ফলে চরমপন্থা, কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সামাজিক রূপ নিতে শুরু করেছে;
- তরুণ প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয়ে চরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চলেছে।

৭.৭. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

- হামলার পর যদি অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার না হয়, তাহলে দায়মুক্তির মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে যেসব হামলা হয়েছে সেগুলোর সঠিক বিচারের কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করছি না, ফলে হামলাকারীরা প্রকারান্তরে আরো বেপরোয়া হচ্ছে;
- মানুষ বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে এমন হামলার পুনরাবৃত্তি হবে।

৭.৮. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ক্ষতি

- বিশ্বজুড়ে সুফি সংস্কৃতি শান্তি, ভালোবাসা ও সহনশীলতার প্রতীক;

- এ ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে;
- টুরিস্ট ও গবেষকদের মাজার-কেন্দ্রিক আগ্রহও কমে যাবে।

৭.৯. আত্মপরচিয়রে সংকট

- সুফি সংস্কৃতি বাংলাদেশের ইসলামি চর্চার স্থানীয় রূপ — যেখানে ফারসি, আরবি ও বাংলা ভাষা, এমনকি আচার ও সংগীতের সংমিশ্রণ রয়েছে;
- মাজার ও সুফি ঐতিহ্যের উপর হামলা মানে দেশীয় ইসলামি ঐতিহ্য ধ্বংস করা, যার ফলে তরুণ প্রজন্ম এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়ে;
- এটা উগ্র, আমদানি করা, সহিংস ধর্মচর্চার দিকে ধাবিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

৭.১০. নারী-ভক্ত ও সাধারণ মানুষের ধর্মচর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা

- মাজার সংস্কৃতিতে নারী-ভক্তদের আলাদা গ্রহণযোগ্যতা ও নিরাপদ ধর্মচর্চার সুযোগ সবসময়ই অবারিত ছিল;
- হামলার ফলে নারীরা ভীত হয়ে আরাধনা, প্রার্থনা ও সাধনার এসব খোলা জায়গা পরিহার করবে, যা ধর্মীয় সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস করে।

৭.১১. লৌকিক সংস্কৃতির বিপন্নতা

- বাংলাদেশে বহু লোককাহিনি, পালাগান, আঞ্চলিক মেলা, উৎসব মাজার ও দরবারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে;
- এসব কেন্দ্র বিনষ্ট হলে লোকজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকগুলো হারিয়ে যায়, ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি বিশাল অধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থেকে যায়।

৭.১২. তরুণদের মাদক-সহিংসতায় জড়ানোর প্রবণতা

- মাজার সংস্কৃতি সাধারণত তরুণদের ধ্যান, সঙ্গীত, সেবামূলক কাজে ব্যস্ত রাখে। যখন এসব ধ্বংস হয়—
    - তখন অনেক তরুণ বেকারত্ব ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে সহিংস গোষ্ঠী, মাদক বা উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৭.১৩. ধর্মীয় অনুশীলনে উদাসীনতা ও বিভ্রান্তি

- সুফি তরিকায় মানুষ ভালোবাসা, ধৈর্য ও আল্লাহর স্মরণে নিবেদিত হয়ে ধর্মচর্চা করে;
- সুফি মাজারে আক্রমণ হলে তা ভক্তদের মনে হতাশা, ভয় ও বিভ্রান্তি তৈরি করে;
- কেউ কেউ ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারে, আবার কেউ চরম মনোভাব পোষণ করতে পারে— দুটোই ধর্ম, সমাজ ও মানুষের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

৭.১৪. সামাজিক বিভাজন ও গোষ্ঠীভিত্তিক দাঙ্গার আশঙ্কা

- একটি গোষ্ঠী সুফিবাদে বিশ্বাস রাখে, অপর গোষ্ঠী তাকে "বিধর্ম" বলে। যখন আঘাত আসে, তখন উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা, অপপ্রচার, প্রতিবাদ-মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সংঘাত সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজচিত্রে তা প্রায়ই ঘটে চলেছে;
- গ্রাম ও পাড়া-আশেপাশে বিভাজন বাড়ছে, যা সহাবস্থানের অন্তরায় হবে এবং একসময় তা বসবাসের অযোগ্য সমাজে পরিণত হতে পারে।

৭.১৫. দাওয়াতি ও মানবসেবামূলক কাজের বিঘ্ন

- সুফি দরবারগুলোতে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ, ফ্রি চিকিৎসা, আশ্রয়, দান-খয়রাত ইত্যাদি হয়ে থাকে;
- হামলার ফলে এসব মানবিক উদ্যোগ স্থবির হয়ে যায়, যার প্রভাব সরাসরি দরিদ্র, প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীর ওপর পড়ে।

৭.১৬. জাতীয় ঐক্যের দুর্বলতা

- সুফি ঐতিহ্য বহুকাল ধরে বাঙালি মুসলমানের ঐক্য ও সহনশীলতা রক্ষার মূলে কাজ করেছে;
- হামলার মাধ্যমে এই ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়, ফলে জাতীয় ও ধর্মীয় ঐক্য হ্রাস পায়, সমাজ আরও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

৭.১৭. আন্তর্জাতিক গবেষণা ও সুফি পর্যটনের ক্ষতি

- অনেক বিদেশি গবেষক ও পর্যটক সুফি সংস্কৃতি অন্বেষণে মাজারগুলো পরিদর্শন করেন;
- হামলা হলে আন্তর্জাতিক পর্যটন, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সংযোগ হ্রাস পায়, দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

৭.১৮. মূল্যায়ন

কুফলের ধরণ	প্রভাব
সাংস্কৃতিক	ঐতিহ্য হারানো, লোকজ ধারা বিপন্ন
ধর্মীয়	আধ্যাত্মিক সংকট, চরমপন্থার ঝুঁকি
সামাজিক	বিভাজন, নারী-বঞ্চনা, সংঘাত
অর্থনৈতিক	দরিদ্রের সেবা বন্ধ, পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত
মানসিক	আতঙ্ক, হতাশা, আত্মপরিচয়ের সংকট

৮. বাংলাদেশের সমাজজীবনে মাজারসমূহের প্রভাব

বাংলাদেশের সমাজজীবনে মাজারসমূহের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক। মাজার শুধু ধর্মীয় উপাসনাস্থল নয়; এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। নিচে এর প্রভাবসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

৮.১. আধ্যাত্মিক আশ্রয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি

- মাজারে মানুষ শান্তি, পরিত্রাণ ও মানসিক সান্ত্বনার খোঁজে আসে;
- দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা বা বিপদে মানুষ মাজারে মান্নত করে, দোয়া করে;
- এই প্রক্রিয়া মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৮.২. সামাজিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির জায়গা

- মাজারে সব ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও শ্রেণির মানুষ একত্রে মিলিত হয়— এটি সমানাধিকারের প্রতীক;
- হিন্দু, খ্রিস্টান এমনকি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষও অনেক সময় সুফি অলিদের শ্রদ্ধা জানাতে মাজারে আসেন;
- মাজার তাই ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী মিলনমঞ্চ হিসেবে কাজ করে থাকে।

৮.৩. দান ও মানবসেবা কার্যক্রম

- অনেক দরবার শরীফে ফ্রি খানা, চিকিৎসা, পোশাক বিতরণ, আশ্রয় ব্যবস্থা চালু থাকে;
- বিশেষ করে গরিব ও প্রান্তিক মানুষ এসব সেবায় সরাসরি উপকৃত হয়;
- এটি সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি রূপ— "সেবা = ইবাদত" এই দর্শনের প্রতিফলন।

৮.৪. নারী-সম্মত আধ্যাত্মিকতা

- সাধারণত মসজিদে নারীদের উপস্থিতি সীমিত হলেও মাজারে নারীর স্বাধীনভাবে প্রবেশ ও দোয়ার সুযোগ থাকে;
- তাই মাজার নারী-সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ধর্মচর্চার জায়গা হয়ে উঠেছে।

৮.৫. লোকজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র

- মাজার ঘিরে গান, পালা, কাওয়ালি, বাউল গান, লোকনাট্য প্রভৃতি গড়ে উঠেছে;
- লালন, হাছন, দুদ্দু শাহ, বিজলী শাহ প্রমুখ সুফি সাধকরা মাজারকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন;
- বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ শাখা সুফি ভাবধারায় প্রভাবিত।

৮.৬. অর্থনৈতিক ও পর্যটন ভূমিকা

- উরস ও ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে মাজার এলাকায় দোকান, হোটেল, যাত্রা, পরিবহন, ফুলবিক্রি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠে;
- অনেক মাজার স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে;
- এটি গ্রামীণ অর্থনীতির এক অন্যতম অংশ।

৮.৭. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র

- অনেক দরবার শরীফে ধর্মশিক্ষা, নৈতিকতা, জিকির, তরিকতের তালিম দেওয়া হয়;
- পীর ও মুরিদ সম্পর্কের মাধ্যমে তরুণদের চরিত্র গঠন, আত্মশাসন ও সেবাবোধ গড়ে ওঠে।

৮.৮. সংঘর্ষ ও সমাধানের স্থান

- অনেক সময় সামাজিক সমস্যা, পারিবারিক বিরোধ বা স্থানীয় বিরোধ পীর সাহেব বা দরবারের হুজুর মীমাংসা করে থাকেন;
- এটি এক প্রকার সামাজিক সালিশ ব্যবস্থা, যা আস্থা ও শান্তির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত।

৮.৯. জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারক

- মাজারগুলো অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ইসলামের আগমনচিহ্ন বহন করে;
- এগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন— যেমন:
    - ষাট গম্বুজ মসজিদ ও খানজাহান আলীর মাজার;
    - শাহ মাখদুমের দরগা, রাজশাহী;
    - হযরত শাহ পরান ও শাহ জালাল (রাহ.)-এর দরগাহ ও মাজার,সিলেট।

৮.১০. মূল্যায়ন

বাংলাদেশের সমাজজীবনে মাজারসমূহ:

আত্মিক প্রশান্তি ও ধর্মীয় অনুশীলনের কেন্দ্র
মানবতা, সমতা ও সহাবস্থানের মঞ্চ
সাহিত্য, সংগীত ও লোকজ সংস্কৃতির প্রাণ
স্থানীয় অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার অংশ
ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক

অর্থাৎ, মাজারসমূহ শুধু ধর্মীয় নয়, বাংলাদেশি সমাজের অন্তঃস্থ শিরা — যা আমাদের মানবিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে।

৯. মাজার সংরক্ষণের কর্মপন্থা

মাজারসমূহ বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চর্চা ও সামাজিক সহাবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এর উপর হামলা, অবহেলা ও আধুনিকায়নের চাপে এগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই মাজার সংরক্ষণে নিচের সমন্বিত ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপন্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন:

৯.১. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতিমালা প্রণয়ন

- প্রতিটি ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক মাজারকে "সংস্কৃতিবিষয়ক ঐতিহ্য" হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে হবে;
- একটি "মাজার সংরক্ষণ নীতিমালা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি, যাতে রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও সংস্কার বাধ্যতামূলক হয়;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ) থেকে নিয়মিত তদারকি ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২. নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা

- গুরুত্বপূর্ণ মাজারে সিসিটিভি, নিরাপত্তাকর্মী, ও পুলিশি টহল নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে উরস বা উৎসবের সময়;
- সাইবার নজরদারি বাড়াতে হবে, যেখানে চরমপন্থী বা বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো হয়।

৯.৩. প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থাপত্যগত সংরক্ষণ

- প্রাচীন মাজারের স্থাপত্য, পাথর, শিলালিপি, দেউল ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে;
- নতুন করে আধুনিক ভবন নির্মাণের সময় মূল ঐতিহাসিক গঠন ও পরিবেশ যেন নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে নিয়ম করা জরুরি।

৯.৪. সুফি সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি

- জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে সুফি সাধক ও মাজারের ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরতে হবে, যাতে নতুন প্রজন্ম এর গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে পারে;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সুফি সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম উৎসাহিত করতে হবে।

৯.৫. স্থানীয় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ

- প্রতিটি মাজারের সঙ্গে একটি স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা উচিত— যাতে মুরিদ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংস্কৃতি কর্মী থাকেন;
- স্থানীয়ভাবে "মাজার সংরক্ষণ দিবস", পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সচেতনতা ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে।

৯.৬. মিডিয়া ও সামাজিক সচেতনতা

- টেলিভিশন, ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদিতে মাজারের ইতিহাস, সুফি দর্শন ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তুলে ধরা যেতে পারে;
- সুফি গানের অনুষ্ঠান, কাওয়ালি, তথ্যচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আকর্ষণ ও ইতিবাচক বার্তা ছড়ানো সম্ভব।

৯.৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

- মাজারকে কেন্দ্র করে ইমাম, পীর, হিন্দু পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে আন্তঃধর্মীয় আলোচনা আয়োজন করা যেতে পারে;
- এতে সহাবস্থান ও সহিষ্ণুতার বার্তা প্রচারিত হবে, যাতে করে চরমপন্থাকে প্রতিহত ও দমন করা যায়।

৯.৮. অর্থায়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

- সরকার ও বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বে "মাজার উন্নয়ন ফান্ড" গঠন করা যেতে পারে;
- বিদেশি পর্যটকদের জন্য সুফি হেরিটেজ ট্যুর চালু করে একদিকে আয়, অন্যদিকে সংস্কৃতি প্রচার সম্ভব।

৯.৯. পরিবেশগত সংরক্ষণ

- অনেক মাজার প্রাকৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত (নদী, পাহাড়, বনের পাশে)। সেগুলোর পরিবেশও সংরক্ষণযোগ্য;
- প্লাস্টিক, শব্দদূষণ, অপরিকল্পিত দোকান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৯.১০. কর্মপন্থার সারসংক্ষেপ

ক্ষেত্র	করণীয়
প্রশাসনিক	নীতিমালা, বাজেট, নিরাপত্তা
সাংস্কৃতিক	গবেষণা, পাঠ্যপুস্তক, মিডিয়া
স্থানীয়	কমিউনিটি অংশগ্রহণ, পরিষ্কার অভিযান

ক্ষেত্র	করণীয়
অর্থনৈতিক	ফান্ড, পর্যটন উন্নয়ন
ধর্মীয়	আন্তঃধর্ম সংলাপ, সহিষ্ণুতা প্রসার

১০. মাজারপন্থীদের সাথে জামাত-হেফাজতের দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশে মাজারপন্থী (সুফিপন্থী মুসলিম) এবং জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি বহুস্তর ও গভীর সামাজিক-ধর্মীয় বাস্তবতার প্রতিফলন। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলো ধর্মীয় মতাদর্শ, আচার, সাংস্কৃতিক চর্চা ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারসংক্রান্ত। নিচে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

১০.১. আধ্যাত্মিকতা বনাম কড়াকড়িভিত্তিক শরিয়া ভাবনা

দিক	মাজারপন্থী সুফিবাদ	জামায়াত/হেফাজত
ধর্মচর্চার ধরণ	প্রেম, ধ্যান, আধ্যাত্মিকতা, সহিষ্ণুতা	কড়াকড়িভিত্তিক শরিয়াহ, নিয়মনিষ্ঠতা
ইবাদতের রূপ	জিকির, দরুদ, পীর-মুরিদ সম্পর্ক, ওরস	সালাত, কুরআন-সুন্নাহর নির্দিষ্ট অনুশাসন
দৃষ্টিভঙ্গি	অন্তর্মুখী সাধনা, মানবতা ও ভালোবাসা	বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ, নীতি ও বিধিনিষেধ

সুফিপন্থীরা ধর্মকে অন্তরজগতের সাধনার পথ বলে মনে করেন, যেখানে জামায়াত ও হেফাজত একে কঠোর শরিয়া-ভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে দেখে।

১০.২. 'বিদআত' (নবউদ্ভাবন) বিতর্ক

- জামায়াত ও হেফাজতপন্থীরা মাজারপূজা, মান্নত, উরস, কাওয়ালি, পীরের দোয়া ইত্যাদিকে "বিদআত" (ইসলামে অবৈধ নবউদ্ভাবন) বলে মনে করে।
- তারা বলেন:

  > "কবরবাসীদের কাছে প্রার্থনা, ওরস, গজল, ফুল দেওয়া — এগুলো শিরক বা গোমরাহী।"

- পক্ষান্তরে সুফিপন্থীরা বলেন:

  > "আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও দোয়ায় শরিক হওয়া বিদআত নয়, বরং সুন্নতের পরিপূরক।"

এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকেই ধর্মীয় মতবিরোধ মূলত দ্বন্দ্বে রূপ নেয়।

১০.৩. পীর-মুরিদি ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ

- সুফি তরিকায় একজন পীর আত্মিক নেতা ও মুরশিদ, যিনি মুরিদদের দিকনির্দেশনা দেন;

- হেফাজতপন্থী আলেমরা মনে করেন, এই অন্ধ অনুসরণ ও পীর-উপাসনা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী;
- অনেকে একে "ব্যক্তিপূজা" বা "অন্ধবিশ্বাস" বলে ব্যঙ্গ করে থাকে।

১০.৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সংঘর্ষ

- বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে মাজারকেন্দ্রিক ধর্মচর্চা, ওরস, গান, উৎসব, তাবারুক বিতরণ সামাজিক ক্ষমতার উৎস;
- হেফাজত বা জামায়াত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী এসব "লোকাচারিক ইসলাম"কে চ্যালেঞ্জ করে শহরকেন্দ্রিক শরিয়াবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- ফলে দ্বন্দ্ব শুধু ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের লড়াইও বটে।

১০.৫. রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা

- মাজারপন্থী অলিরা বহু জায়গায় জনসমর্থন ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা রাখেন— স্থানীয় নির্বাচনে প্রভাব রাখেন, নেতা তৈরির উৎসও বটে;
- জামায়াত ও হেফাজতের লক্ষ্য হলো সমাজে ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং "তাগুতি পন্থা" দূর করা— যেখানে মাজারপন্থীরা তাদের বাধা বলে বিবেচিত।

এই কারণে অনেক সময় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেও মাজারগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

১০.৬. শিক্ষা ও দাওয়াতি কৌশলভেদের দ্বন্দ্ব

- সুফি পীররা মূলত ভক্তির মাধ্যমে দাওয়াত দেন, যেখানে পীর-মুরিদ সম্পর্ক এক ধরনের পারিবারিক স্নেহে গাঁথা;
- হেফাজতের মাদ্রাসাভিত্তিক দাওয়াত হয় বিদ্যাবদ্ধ, কড়াকড়িভিত্তিক ও যৌক্তিক বিতর্ক নির্ভর — যা সুফিপন্থীদের অপছন্দনীয়।

১০.৭. শান্তিমূলক ধর্মচর্চা বনাম উগ্রতার বিরোধ

- সুফিপন্থীরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সংগীত, সমবেদনা ও নির্বিচারে মানব সেবা প্রচার করে;
- হেফাজতপন্থীরা নারী স্বাধীনতা, সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, সংগীত ইত্যাদিকে পশ্চিমাপন্থী ও ইসলামবিরোধী হিসেবে দেখে;
- এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংঘাতই দ্বন্দ্বের অন্যতম শিকড়।

১০.৮. দ্বন্দ্বের সারাংশ

বিষয়	মাজারপন্থী	জামাত/হেফাজত
ধর্মীয় ধারা	সুফিবাদ, তরিকত	সালাফি/দেওবন্দি
ধর্মচর্চা	ওরস, জিকির, দান	কড়া শরিয়াহ, বিদআতের বিরোধিতা
নেতৃত্ব	পীর-মুরিদ	মাদ্রাসা-উলামা ভিত্তিক
দৃষ্টিভঙ্গি	অন্তর্মুখী, সহনশীল	বাহ্যিক আচরণ, কড়াকড়ি
লক্ষ্য	আধ্যাত্মিকতা, শান্তি	শাসনব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা
সাংস্কৃতিক ভূমিকা	সংগীত, উৎসব, উরস	সাদাসিধে, সংগীতবিরোধী

১০.৯. সমাধান কী হতে পারে?

- আন্তঃমধ্যম সংলাপ (Inter-sect Dialogue);
- ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা;
- রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সব ধারার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা;
- উগ্রতা ও সহিংসতা রুখতে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

১১. পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী

মাজারপন্থী সুফি ধারার অনুসারী ও জামায়াত-হেফাজতপন্থী কড়াকড়ি ইসলামপন্থীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে অনেক শ্রেণি-পেশার মানুষ ভুক্তভোগী হচ্ছেন। নিচে এই ভুক্তভোগী গোষ্ঠীগুলোর বিস্তারিত তালিকা ও তাদের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো:

১১.১. সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান

- যারা পীরের কাছে দোয়া নিতে যায়, মান্নত করে, ওরস শরীফে অংশ নেয়— তারা সহজ টার্গেটে পরিণত হয়;
- হেফাজত-জামায়াতপন্থীরা তাদের "বিপথগামী" বা "বিদআতির অনুসারী" হিসেবে অপবাদ দেয়;
- এতে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চর্চার স্বাধীনতা ব্যাহত হয় এবং তারা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে।

১১.২. পীর-মুরিদ সম্প্রদায় ও সুফি দরবারের ভক্তরা

- উরস, মিলাদ, তবারুক, জিকির-মাজলিস ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অনেক দরবার চলে— এসব অনুষ্ঠানে হামলা, হুমকি বা অবজ্ঞার কারণে তাদের আত্মিক চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়;
- অনেক দরবারে সম্প্রতি হামলা, আগুন, বোমা বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (উদাহরণ: সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া)।

১১.৩. নারীরা

- সুফি দরবারগুলো নারীদের জন্য ধর্মীয় আচার পালনের একমাত্র উন্মুক্ত স্থান অনেকক্ষেত্রে;
- চরমপন্থী গোষ্ঠী নারীদের অংশগ্রহণকে "অবৈধ" বা "আব্রু-বিধ্বংসী" বলে হুমকি দিলে নারী-ভক্তরা ধর্মীয় চর্চা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

১১.৪. তরুণ প্রজন্ম

- একদিকে তারা সুফি সংগীত, প্রেমময় ইসলাম, আধ্যাত্মিকতা ও সহনশীলতার দিকে আকৃষ্ট; অন্যদিকে কড়া শরিয়াপন্থী গোষ্ঠী তাদের এই আকর্ষণকে “গোমরাহ” বলে দমন করতে চায়;
- ফলে তরুণদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়— তারা কার পথ ধরবে, কীভাবে ধর্মচর্চা করবে, সে বিষয়ে অনিশ্চয়তায় পড়ে।

১১.৫. সুফি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীতচর্চাকারী শিল্পীরা

- সুফি গানে পীর, প্রেম, ও আত্মার কথা থাকায় চরমপন্থীরা একে "গজবের গান", "নাজায়েজ" আখ্যা দেয়;
- ফলে অনেক লোকগায়ক, বাউল, ও সুফি সংগীতশিল্পী হুমকি পান, অনুষ্ঠান বাতিল হয়, জীবিকা হারান।

১১.৬. দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ

- দরবারগুলোতে বিনামূল্যে খাবার, চিকিৎসা, আশ্রয়, ও দান দেওয়া হয়— যা দরিদ্র মানুষদের জন্য আশীর্বাদ;
- যদি কোনো দরবার হামলার শিকার হয় বা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এসব মানবিক সহায়তা থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয়।

১১.৭. শিক্ষার্থী ও গবেষকরা

- সুফি ইতিহাস, বাংলা সুফি সাহিত্য বা মাজার সংস্কৃতি নিয়ে যারা গবেষণা করতে চান, তারা অনেক সময় হুমকি বা সামাজিক বাধার মুখে পড়েন;
- অনেক মাদ্রাসা বা ধর্মভিত্তিক শিক্ষায় এইসব বিষয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়।

১১.৮. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী

- যারা বহুত্ববাদ, সহনশীলতা ও মানবতাবাদী ইসলাম প্রচার করেন, তারা চরমপন্থীদের বিদ্বেষ ও আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন;
- তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ বা গালিগালাজের শিকার হন।

১১.৯. আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের পৃষ্ঠপোষক

- মাজারগুলোতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এমনকি উপজাতিরাও মান্নত বা দান করে থাকেন;
- চরমপন্থীরা একে "কুফরি বা শিরক" আখ্যা দিয়ে সহাবস্থান নীতিকে আঘাত করে, ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

১১.১০. ভুক্তভোগীদের শ্রেণি ও তাদের ক্ষতি

ভুক্তভোগী	কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ	দোয়া, মান্নত, ওরস—সব নিষেধাজ্ঞার শিকার
পীর-মুরিদ	আধ্যাত্মিক চর্চা বাধাগ্রস্ত, নিরাপত্তাহীনতা
নারীরা	ধর্মীয় চর্চার সুযোগ হারায়
তরুণ	বিভ্রান্তি, উগ্রতা বা হতাশায় ঝুঁকে পড়ে
শিল্পীরা	জীবিকা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হারায়
দরিদ্র জনগণ	তবারুক, সেবা থেকে বঞ্চিত
গবেষকরা	চাপ, ভয় ও হুমকির মুখে
সংখ্যালঘু ও সহাবস্থানের সমর্থকরা	সহিষ্ণু পরিবেশের সংকট

১২. মাজার ও সুফিপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের সখ্যতা

বাংলাদেশে মাজার ও সুফিপন্থী সম্প্রদায়ের সাথে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সখ্যতার পেছনে নানা ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। তবে, প্রথমেই এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন সুফি, দরবেশ ঘরানার; যাঁরা একান্তই ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য এই বঙ্গে হিজরত করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে মাজার ও সুফিপন্থীদের সম্পর্কের আরো কারণগুলোকে নিচে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হলো:

১২.১. ঐতিহাসিক ভিত্তি: মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদে ভূমিকা

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সুফি দরবার ও মাজারগুলো জনমত গঠনে, সংগঠন গঠনে ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে;

- বিশেষ করে, সিলেটের শাহ জালাল, বগুড়ার দরবার, রংপুর, খুলনার মাজারগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় জনমঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে;
- আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী চেতনায় সুফি বাঙালির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল।

১২.২. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সম্মান

- আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পক্ষপাতী হিসেবে পরিচিত;
- সুফিপন্থা দেশের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাদের প্রতি আওয়ামী লীগ সরকার ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রদর্শন করে;
- মাজার সংরক্ষণ, উরস উৎসবকে সমর্থন ও জনসাধারণের কাছ থেকে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনমত ও সামাজিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

১২.৩. জনসাধারণের রাজনৈতিক শক্তি ও ভোটের ভিত্তি

- মাজারপন্থী পীর-মুরিদদের সামাজিক প্রভাব অনেক জায়গায় ভোটব্যাংক হিসেবে কাজ করে;
- বিশেষ করে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দরবারগুলোর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সমর্থন অর্জন করে;
- ফলে পীরগণ ও সুফি গোষ্ঠীর প্রতি অবিরাম শুভেচ্ছা ও সেবাকর্ম বজায় রাখতে আওয়ামী লীগ সর্বদা সচেষ্ট।

১২.৪. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার চিত্র

- আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হওয়ায় সুফি সংস্কৃতির সহিষ্ণু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবনার সাথে সুসম্বন্ধ বজায় রাখে;
- এই সম্পর্ক বাংলাদেশের ধর্মীয় একতা ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

১২.৫. রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

- জামায়াত-হেফাজত প্রভৃতি গোষ্ঠী কট্টরপন্থী ও কিছু সময় রাজনীতিতে ধর্মীয় দল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যারা সুফিপন্থাকে "বিদআত" হিসেবে আক্রমণ করে;
- আওয়ামী লীগ এই সুযোগটিও গ্রহণ করে, যার ফলে সুফিপন্থীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সহায়তাও লাভ করে থাকে;
- বিশেষ করে মাজার ও সুফিপন্থী হিসেবে পরিচিত দেশের সুন্নি ঘরানার আলেমদের সাথে আওয়ামী লীগের গভীর সখ্যতা রয়েছে।

১২.৬. স্থানীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

- স্থানীয় মাজার ও দরবারগুলোতে সামাজিক উন্নয়ন, দানবৎ কার্যক্রম, শিক্ষাসহ নানা কল্যাণমূলক কাজ চালানো হয়;
- আওয়ামী লীগ এসব দরবারের মাধ্যমে জনগণের পাশে থাকা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিফলন লাভ করে।

১২.৭. সখ্যতার সারাংশ

কারণ	বিবরণ
ঐতিহাসিক	মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক
সাংস্কৃতিক	সুফি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ
রাজনৈতিক	ভোটব্যাংক ও জনমতের সমর্থন
ধর্মনিরপেক্ষতা	ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ঐক্যের চিত্র
বিরোধী দল	জামায়াত-হেফাজতের বিরুদ্ধ অবস্থান
স্থানীয় উন্নয়ন	দরবার ও সমাজকল্যাণে সহযোগিতা

১৩. আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মাজার ও সুফি সংস্কৃতির উপর আঘাত

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে মাজার ও সুফি সংস্কৃতির উপর আঘাতের কারণগুলো মূলত রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গভীর ও বহুমুখী। নিচে এর প্রধান কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

১৩.১. রাজনৈতিক ক্ষমতার শূন্যতা ও ধর্মীয় দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি

- আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কিছু গোষ্ঠী যেমন জামায়াত-শিবির, হেফাজতে ইসলাম বা আরও কঠোর ইসলামি ভাবাদর্শিক দলগুলোর মধ্যে মাজারভিত্তিক সুফি সংস্কৃতিকে "বিদআত" বা অবৈধ হিসাবে দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়;
- তারা মাজার, পীর-মুরিদি সম্পর্ক ও উরস উৎসবকে ধর্মীয় কুশীলবতা ও শিরকি আচরণ মনে করে এবং এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়;
- ফলে এই গোষ্ঠীটির প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাজার ও সুফি সংস্কৃতির স্থানসমূহে আক্রমণ, ভাংচুর ও লুটপাট শুরু হয় এবং তা এখনো অব্যাহত আছে।

১৩.২. ধর্মীয় উগ্রতা ও জিহাদি মতবাদ বৃদ্ধি পাওয়া

- দেশের ক্ষমতার পট-পরিবর্তনের পর উগ্রবাদী মতবাদ, সালাফি-ওয়াহাবি ধর্মচর্চা এবং জিহাদি সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি পায়;
- তারা সুফিবাদের সঙ্গে সংঘর্ষ পছন্দ করে, কারণ সুফিদর্শন সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা ও ঐক্যের বার্তা দেয়, যা তাদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে;
- এ কারণে সুফি মাজার, ওরস উৎসব ও তরিকাপন্থীদের ওপর হামলা, হুমকি ও বোমাবাজি বৃদ্ধি পায়।

১৩.৩. আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দুর্বলতা ও বিচারহীনতা

- বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময়ে দেশের পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃংখলা বাহিনী এবং সরকারি প্রশাসনের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও পক্ষপাতমূলক মনোভাবের কারণে মাজারে হামলা বা সহিংসতায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না;
- এতে অপরাধীদের প্ররোচনা ও পুনরায় হামলার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- বিচারহীনতা মাজার ও সুফি সংস্কৃতির ওপর আঘাতকে উৎসাহিত করে চলেছে।

১৩.৪. সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সামাজিক অস্থিরতা

- ক্ষমতার শূন্যতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বৃদ্ধি পায়;
- মাজারের মতো ঐক্যের প্রতীক জায়গাগুলোকে সরাসরি লক্ষ্যবস্তু করা হয় যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নানান গোষ্ঠী ফায়দা হাসিল করতে পারে;
- এ পরিস্থিতিতে গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতা কমে যাচ্ছে, সুফি সংস্কৃতি কেন্দ্র ও মাজারের নিরাপত্তা প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

১৩.৫. রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অপপ্রচার

- যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো তাই মাজার ও সুফি গোষ্ঠীর সমর্থকদের দমন বা রাজনৈতিক বদলা নেওয়ার জন্য এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে;
- মাজার ও দরবারকে বাংলাদেশে অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এজন্য বর্তমানে সরকারের আনুকূল্য প্রাপ্তরা তাদের বিরোধী হিসেবে এই শক্তিকে সনাক্ত করেছে।

১৩.৬. সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের ধ্বংসযজ্ঞ

- আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলবাদী ভাবধারা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রভাবে লোকসংস্কৃতি ও সুফি চর্চার অবক্ষয় ঘটে চলেছে;

- অনেকেই সুফিবাদের গান, আচার-অনুষ্ঠান, ওরস উৎসবকে "ধর্মবিরোধী" বলে সমালোচনা শুরু করে এবং এগুলো জোরপূর্বক অনেক জায়গায় বন্ধ করে দিচ্ছে।

১৩.৭. আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

- কিছু আন্তর্জাতিক ইসলামি সংগঠন ও তাদের প্রদেয় তহবিল কাজে লাগিয়ে সুফি দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে;
- অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অবনতি মাজার সংলগ্ন এলাকাগুলোর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

১৩.৮. সংক্ষিপ্ত সারাংশ

কারণ	বর্ণনা
রাজনৈতিক পরিবর্তন	কঠোর ইসলামপন্থী দলগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি
ধর্মীয় উগ্রতা	সুফিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও সহিংসতা
প্রশাসনিক দুর্বলতা	অপরাধীদের বিচারহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতা
সাম্প্রদায়িক বিভাজন	মাজার লক্ষ্য করে উত্তেজনা সৃষ্টি
রাজনৈতিক প্রতিহিংসা	বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক চাপানো হামলা
সাংস্কৃতিক অবক্ষয়	লোকসংস্কৃতি ও সুফি চর্চার হ্রাস
আন্তর্জাতিক প্রভাব	বাহ্যিক তহবিল ও মতাদর্শের দমন

১৪. উপসংহার

বাংলাদেশের সামাজিক সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মাজার ও সুফি সংস্কৃতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ২০২৪ সালের আগস্ট পরবর্তী পট-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মাজারসমূহ ও সুফি সংস্কৃতি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে চলেছে। বিভিন্ন মাজারে হামলা, ধ্বংসজজ্ঞ ও লুটপাটের পাশাপাশি এগুলোর বেশিরভাগ দখল নেয়া এবং চাঁদাবাজিতেও অনেকে ব্যস্ত হয়ে আছে। বর্তমানে যারা দেশের ক্ষমতা ভোগের উৎসবে অংশীদার তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদেই অধিকাংশ ঘটনা ঘটে চলেছে। তাই, এসবের প্রতিকারে ও প্রতিরোধে কার্যত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এতে দেশের সামাজিক অস্থিরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজের সর্বত্র এক ধরনের অস্বস্তি বিরাজ করছে। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ে যত বেশি গাফলতির পরিচয় দেবেন, পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকবে এবং দেশের মাজার সংস্কৃতি ও সুফি ঐতিহ্য বিলুপ্ত হতে থাকবে। আর এর পরিণাম ও কুফল ভোগ করবে দেশের সাধারণ মানুষ, যারা একটি শান্তিপূর্ণ জীবন, সহাবস্থানপূর্ণ সমাজ ও সম্প্রীতিময় পরিবেশের জন্য

অহর্নিশি প্রার্থনা করে থাকেন। নিরীহ গণমানুষের এই প্রার্থনা আর আর্তনাদ যত দ্রুত ক্ষমতাসীনদের কর্নকুহরে প্রবেশ করবে তত দ্রুতই দেশ ও দশের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

লেখকঃ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক